গোয়েন্দা যখন চোর হয়

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

অন্নপূর্ণা প্রকাশনা
৩৬নং কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
বিজয়কৃষ্ণ দাস
৩৬, কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৮

মুদ্রাকর :
জি. চ্যাটার্জী
৭৫, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে

বড়মামা

GOYENDA YAKHAN CHOR HAI

by : Gouranga Prosad Basu

সত্যি, কি যে ঝকমারি করেছি এই গোয়েন্দাগিরি পেশা করে! সংসারে এত পেশা থাকতে এই সর্বনাশা পেশা বেছে নিয়ে!

গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস প'ড়ে অনেকেরই ধারণা দেখেছি যে, এই গোয়েন্দাগিরি পেশাটা খুবই বাহাদুরির। বাহাদুরির যে নয়, তা আমি বলছি না, কিন্তু সেটা কতক্ষণের? মানে, মাসের মধ্যে ক'দিনের? সরকারী অর্থাৎ পুলিশের গোয়েন্দাদের কথা আলাদা। আমার মতন বেসরকারী অর্থাৎ স্বাধীন গোয়েন্দাগিরি যাদের পেশা, তাদের তো মাসের বেশির ভাগ দিনই কাটে মামলার আশায় অফিসে বসে খবরের কাগজ প'ড়ে আর হাই তুলে; কড়িকাঠ গুণে আর প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস ক'রে। কখন হয়তো তারই মধ্যে বেজে উঠল টেবিলের টেলিফোন, কিম্বা জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল দরজার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠল মন। তারপর দেখা গেল ফোনেতে নম্বর ডায়েল করতে ভুল করেছে কেউ, কিম্বা দরজার বাইরের পায়ের শব্দটা কখন দরজা পেরিয়ে চলে গেছে।

একটানা পনেরো-বিশ দিন এই রকম হতাশ অপেক্ষার পর হয়তো সত্যিই একদিন একজন মক্কেল এল আর মামলা এল সত্যিই একটা হাতে। তারপর সেই মামলার কাজে অর্থাৎ আমার মক্কেলের মুস্কিল আসানের জন্যে সাত, দশ, বা চোদ্দ দিন আহার নিদ্রার আর কোন ফুরসৎই হলো না আমার। মক্কেলের প্রয়োজনে হয়তো ছুটতে হ'ল একবস্ত্রে কলকাতার বাইরে—দেরাদুন বা উটাকামণ্ডে। কিম্বা হয়তো এই খাস কলকাতাতেই মাঝরাতে পেছনের পাঁচিল টপকে ঢুকতে হলো কোন বাড়িতে। তারপর সেই বাইরে গিয়ে বা এই কলকাতাতেই কোথাও কারুকে দিয়ে কোন কথা কবুল করতে হয়তো ঘুষি মেরে উপড়ে নিতে হলো তার দু-চারটে দাঁত। সেইসঙ্গে আমার মক্কেলের ধন, প্রাণ বা মান যে জিনিসের উপর নির্ভর করছে, সেই প্রমাণ বা দলিল হস্তগত করতে হয়তো ভাঙতে হলো কোন সিন্দুক!

অথচ, এত যে ইয়রানি ও পরিশ্রম, জেলে যাবার ব্যবস্থা ও প্রাণসংশয় (হ্যাঁ, পাল্টা ঘুষি এবং শুধু ঘুষি নয়, ছুরি ছোরা এবং গুলিও খেতে হয়েছে আমায়। রক্ষে, সেগুলির কোনটাই শরীরের মোক্ষম জায়গায় বর্ষিত হয়নি) ক'রে যে টাকা আমি রোজগার করি তাতে আমার গ্রাসাচ্ছাদন কোন রকমে চলে যায় বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অন্য যে কোন পেশায় গেলে আমি হলপ করে বলতে পারি, এর চেয়ে অনেক নিশ্চিন্তে ও সুখে থেকেও এর চেয়ে বেশি ছাড়া কম রোজগার আমি করতাম না।

তাই অফিসে নিষ্কর্মা ব'সে হাই তুলতে তুলতে মাঝে মাঝে যে পেশা বদলানোর কথা আমি ভাবি না, এমন নয়। কিন্তু ঐ ভাবা পর্যন্তই! তার বেশি কিছু আর করা হ'য়ে ওঠে না। অন্তত এখনও পর্যন্ত করতে পারিনি।

কী ক'রেই বা পারবো? গোয়েন্দাগিরি শুধু যদি আমার পেশা হ'ত তাহলে হয়তো বদলাতে পারতাম। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি তো এখন আর আমার শুধু পেশা নয়, সেই সঙ্গে যে নেশাও!

সেদিনও অফিসে ব'সে কড়িকাঠ গুণতে গুণতে সেই সব কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, সত্যি, নেশা জিনিসটাই খারাপ, তা সে মদ-গাঁজারই হোক আর অ্যাডভেঞ্চারেরই হোক। নেশা মাত্রেই শেষ পর্যন্ত একদিন সর্বনাশ ডেকে আনে মানুষের। ভাবছি, আমারও এই অ্যাডভেঞ্চারের নেশাটাই না শেষপর্যন্ত একদিন কাল হয় আমার, কারণ হয় তো বেঘোরে এই প্রাণটা যাবে।

তা, এই সর্বনেশে নেশা ছাড়বার কি কোন উপায় নেই আমার? গত সাত বছর ধ'রে তো অনেক মক্কেলের মুস্কিল-আসান করেছি আমি। বাঁচিয়েছি তাঁদের ধন, প্রাণ এবং সম্মান। কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় নিয়ে যাবার সময় তাঁদের মধ্যে অনেকেই তো ব'লে গিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে যেন তাঁদের আমি নিশ্চয়ই স্মরণ করি। যে উপকার আমি তাঁদের করেছি, সামান্য পারিশ্রমিকের টাকা দিয়ে নাকি সে সবের ঋণ

শোধ হয় না, কখনও হবার নয় এবং তাই প্রত্যুপকারের একটা সুযোগ কখনও পেলে তাঁরা বাধিত হবেন।

সেই সব মক্কেলদের মধ্যে কোটিপতি ব্যবসায়ী, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য-সরকারের মন্ত্রী, টাকার কুমীর দেশীয় রাজা-মহারাজা—অর্থাৎ দেশের কেষ্টবিষ্টু অনেকেই রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কার সনির্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করা যায়, অর্থাৎ কাকে ধ'রে বা কার সাহায্যে একটা ভদ্রগোছের চাকরি নিয়ে বা ব্যবসা ফেঁদে, অ্যাডভেঞ্চারের সর্বনাশা পরিণতির লক্ষ হস্ত দূরে থেকে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সেই চিন্তায় বাধা পড়ল আমার।

অফিসের ঠিক বাইরে—কড়িডরে অচেনা পদক্ষেপ যেন কানে এল একটা।

ভারী জুতোর শব্দ, অর্থাৎ পদযুগল নারীর নয়, কোন পুরুষের।

অফিসের প্রায় দরজার কাছে এসে থেমে গেল পদক্ষেপ। হয় ঠিক ঠিকানায় এসেছে কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চাইছে আগন্তুক, কিম্বা ইতস্তত করছে ভিতরে আসতে!

না, শেষপর্যন্ত নিঃসন্দেহ হ'য়ে বা মনস্থির ক'রে ঢুকেই এল আগন্তুক কিন্তু অফিসে ঢুকে আবার কেন দাঁড়িয়ে পড়ল?

হুঁ, বেয়ারা বাবুলাল গিয়েছে একটা চিঠি ছাড়তে। বাইরের খালি অফিসে আমার সেক্রেটারি থেকে টাইপিষ্ট, একাধারে কেরানী থেকে ম্যানেজার শ্রীমতী এলা মাথুরকে একা টেবিলে ব'সে একমনে উল বুনতে দেখে বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছে। সেইজন্য বেশ কিছুটা হতশ্রদ্ধ আমার সম্বন্ধে! এই বুঝি চলে যায় মক্কেল, ঘরে পা দিয়েও ফিরে যায় লক্ষ্মী।

না, ঐ তো ড্রয়ার খোলার ও বন্ধ করার শব্দ! অর্থাৎ, তার মধ্যে বোনাটা পুরে রেখে এলা তৎপর হয়েছে। ওই তো যে সবিনয়ে এবং ইংরেজিতে প্রশ্ন করছে আগন্তুকের আগমনের কারণ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে।

ইংরেজিতে যখন প্রশ্ন করছে এলা তখন আগন্তুকের পোশাক নিশ্চয়ই সাহেবী। দেশী পোশাক দেখলে এলা কথা বলে হিন্দিতে বা বাংলায়। বাংলাটা এখনও একটু ভাঙা ভাঙা বলে এলা, কিন্তু অন্য দুটো ভাষা চমৎকার। আমার সঙ্গে কাজ করতে করতে ওর-ও যেন নেশা লেগে গিয়েছে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের। কয়েকটা মামলার ব্যাপারে ওর দুঃসাহস দেখে—আমি যে আমি—আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছি। ভয় পেয়ে লাইসেন্স করিয়ে একটা ছোট রিভলভারও ওকে কিনে দিয়েছি।

এলার প্রশ্নের উত্তরে এবার আগন্তুকের গলা শোনা গেল। আমার সঙ্গে গোপন একটা প্রয়োজনে দেখা করতে চায় ব'লে জানাল সে এলাকে। জানাল ইংরেজিতে—উচ্চারণটা না ভারতীয়, না বিলিতি!

- কী নাম, কোত্থেকে এসেছেন তাহলে বলবো, মিঃ চৌধুরীকে? প্রশ্ন করল এলা।

—না, আমার কার্ড দেখছি ফেলে এসেছি—এলার প্রশ্নের কয়েক সেকেণ্ড পর উত্তর দিল আগন্তুক। অর্থাৎ, পকেটপত্র একবার হাতড়ে নিয়ে—আমার নাম বেন মোজেস। আমি বোম্বাইয়ের একজন ব্যবসায়ী।

অর্থাৎ, লোকটা ইহুদি।

চেম্বারের মধ্যে—চেম্বার ব'লতে ছাদের কড়িকাঠ বরাবর নামানো কাঠের একটি পার্টিশন, যার দরজা খোলা রাখলে বাইরে সব আওয়াজই কানে আসে আমার—সেই চেম্বারের মধ্যে আমার টেবিলের ইণ্টার-কম্যুনিকেশন যন্ত্রটিতে গলা ভেসে এল এলার!

— মিঃ মোজেস নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

—কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল কি? যন্ত্রটির সুইচটা ঘুরিয়ে দিয়ে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম। বলাবাহুল্য, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল না—সেটা খুব ভাল ক'রেই জানা ছিল আমার। কিন্তু কী করব, মক্কেলের কাছে ঠাট রাখতে এ-রকমটা করতেই হয়।

—না। উত্তর দিল এলা।

—ওর প্রয়োজনটা কি খুব জরুরী? নাহলে কাল···এক সেকেণ্ড! আমি যেন কালকের অ্যাপয়েন্টমেণ্টগুলি দেখে নিলাম—হ্যাঁ, কাল বিকেল পৌনে চারটেতে উনি আসতে পারেন।

শুনে এলা চুপ করে রইল। বোধহয় মুখ তুলে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। এলা ও আমার সব কথাই তো কানে যাচ্ছে তাঁর!

—হ্যাঁ, প্রয়োজনটা খুবই জরুরী। মিঃ চৌধুরী এখনই একটু সময় করতে পারলে ভাল হয়—ভদ্রলোককে বলতে শুনলাম এলার কাছে। তারপর এলা বলল আবার ঐ কথাগুলি আমাকে ইণ্টারকম্যুনিকেশনে। ব'লে জিগ্যেস করল সেই সঙ্গে—ওঁকে ভেতরে নিয়ে আসতে পারি?

আসবে? আচ্ছা এস! ব'লে তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে খবরের কাগজগুলি তুলে ড্রয়ারে পুরে ফেললাম, আর ড্রয়ার থেকে পুরানো একটা কেসের ফাইল নিয়ে খুলে রাখলাম টেবিলের ওপর। শুধু খুলে রাখা নয়, বিশেষ মনঃসংযোগের ভান করলাম তাতে। তারপর এলার সঙ্গে আগন্তুক চেম্বারে ঢুকতে মুখ তুললাম ব্যস্তভাবে আর সেই সঙ্গে আমাদের পেশায় যা দস্তুর—আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ ক'রে নিলাম নতুন মক্কেলের।

মাঝারী লম্বা, মাঝারী স্বাস্থ্যের মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। মাথায় কালো ফেল্টের টুপি, পরণে কালো স্যুট, চোখে ভারী কালো চশমা এবং ইহুদি-সুলভ বাঁকা নাকের তলায় বাহার ক'রে ছাঁটা মোটা কালো গোঁফ। এতগুলি কালোর সমারোহ ফর্সা চেহারায় মানিয়েছেও সুন্দর! কালোর উপরে লাল চেকের টাইটা আবার যেন একটা শৌখিনভাব এনে দিয়েছে চেহারায়। দেখা না গেলেও এ রকম মানুষের পায়ের মোজা আর পকেটের রুমালও যে পোশাকের সঙ্গে ম্যাচকরা তাতে ভুল নেই।

চেম্বারে ঢুকেই ভদ্রলোক করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে বাঁ হাতে টুপিটা একটুক্ষণের জন্য তুলে ধরলেন মাথা থেকে—গুড আফটারনুন! আমি বেঞ্জামিন মোজেস। আশা করি, খুব অসুবিধে করলাম না আপনার, কয়েক মিনিট সময় চেয়ে?

করমর্দন করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ভারিক্কি হাসি হেসে

বললাম—আমার নাম বুশল চৌধুরী। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় খুশি হলাম। অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। আর সময় বোধহয় আমাদের দু-জনেরই কম। দেরি না করে বরং কাজের কথা আরম্ভ করা যাক!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! সায় দিয়ে উঠলেন বেন মোজেস চেয়ারে বসতে বসতে। আমিও ফিরে তাকালাম এলার দিকে। সেই ইঙ্গিতে চেম্বারের দরজাটা তাড়াতাড়ি টেনে দিয়ে চলে গেল এলা। আর বেশিক্ষণ খোলা রাখলে ইন্টার-কম্যুনিকেশন যন্ত্রটি দিয়ে আমার ও এলার একটু আগের অভিনয় ধরা পড়ে যাবে লোকটার কাছে—খোলা দরজা দিয়ে অফিসের বাইরে করিডোরের মানুষ চলাফেরার আওয়াজ পর্যন্ত কানে ভেসে আসে।

এলা চলে যেতে, চেয়ারে ব'সে টেবিলের ওপর ফাইলের খোলা পাতাটায় পেন্সিলের একটা নিশানা দিয়ে, সেটা বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখলাম আমি। তারপর ইন্টার-কম্যুনিকেশনের যন্ত্রটির সুইচ ঘুরিয়ে দিয়ে তাকালাম বেন মোজেসের দিকে। বললাম—আপনার কথা শোনবার জন্য আমি এখন প্রস্তুত। কিন্তু তার আগে কতকগুলি কথা আপনাকে জানানো দরকার। আমাকে দিয়ে বিশেষ কোন কাজ করাতেই নিশ্চয়ই আপনি এসেছেন?

—হ্যাঁ, তাই এসেছি! উত্তর করলেন বেন মোজেস—যদি আপনি কাজটা করতে পারেন।

—যদি পারি তো আমার ফী কীরকম হবে সেটা গোড়াতেই আপনার জানা ভাল। সাধারণতঃ মক্কেলদের কাজে যে ক'দিন ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে, তার প্রতিদিনের জন্য পাঁচশো টাকা ক'রে নিয়ে থাকি। আমি, মানে ব্যক্তিগতভাবে আমিই। কাজ সমাধা করতে আনুষঙ্গিক খরচপত্র যা হবে বা আমাকে করতে হবে, সেটা আলাদা দিতে হয় মক্কেলদের। এটা সাধারণভাবে। তবে যদি কাজটা খুবই বিপজ্জনক হয়, তাহলে আমার টাকার অঙ্কটা বেড়ে যাবে। কতটা

বাড়বে সেটা নির্ভর করবে ঐ কাজের বিপদের ঝুঁকি কতখানি তার ওপর।

—পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে, জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকে একটা সিন্দুক ভাঙতে আপনি কত নেবেন? সঙ্গে সঙ্গে জিগ্যেস করলেন বেন মোজেস।

শুনে বেশ রোমাঞ্চিত হলাম। ভাল ক'রে একবার তাকালাম বেন মোজেসের দিকে। মক্কেলটি সহজ নয় বুঝতে পারলাম, কেননা এ-হেন প্রশ্ন ক'রেও মুখের ভাবের বিশেষ বদল হয়নি তার।

আমাকে ওইভাবে তাকাতে দেখে বেন মোজেস চট ক'রে আবার ব'লে উঠলেন—কাজটা করতে কি আপনার কোন অসুবিধা আছে?

—সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করছে কাজটির উদ্দেশ্যের ওপর। আমি জবাব দিলাম—যদি সাধারণ চুরি হয়, তাহলে আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন এবং সময় নষ্ট করছেন আপনার আমার দু'জনেরই!

—আর যদি সাধারণ চুরি না হয়?

—কীরকম অসাধারণ সেটা আমার জানা দরকার!

—যদি ঐ সিন্দুকের মধ্যে এমন কোন দলিল থাকে, যা প্রায় প্রাণদণ্ডের মতনই একটা সর্বনাশ রদ করতে পারে একজনের!

শুনে চট ক'রে ভাবতে হলো আমাকে, ভাবতে হলো নানাভাবে—ব্যাপারটা আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য কারুর কোন ষড়যন্ত্র কিনা! কিন্তু সেটা বুঝতে হ'লে আরো একটু বুঝি জানা দরকার ব্যাপারটা, নইলে কোন সিদ্ধান্ত করা যাবে না—চট ক'রে ভেবে নিয়ে বললাম—সত্যি যদি তাই হয়, তাহলে অবশ্য ঐ চুরির উদ্দেশ্যটা মহৎ ব'লেই ভাবতে পারব আমি। কাজটা নিতেও আমার আপত্তি থাকবে না!

—ফা কত নেবেন?

—সেটা বলবার আগে কোথা থেকে, কীরকম সুরক্ষিত জায়গা থেকে চুরিটা করতে হবে সেটা জানতে হবে আমাকে। হাতে-নাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কতখানি, পরে তদন্ত হলো বা কী রকম, হিসাব ক'রে দেখতে হবে সেটা!

—ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজটা আমিই করতাম, পাইপ বেয়ে ওঠা এবং সেই সঙ্গে সিন্দুক ভাঙার বিদ্যে যদি আমার জানা থাকতো!

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কাজটায় একদিনের বেশি সময় লাগবে না!

—পুরো একদিনও লাগবে না। পরশু মানে শনিবার সন্ধের পর ঘণ্টা খানেকের কাজ!

—হাজার টাকা নেব আমি। পাঁচশো টাকা অগ্রিম, পাঁচশো কাজ সমাধা হ'লে।

—হাজার টাকা! এক মুহূর্ত ভেবে নিলে বেন মোজেস আমি তাই দেব।

—বেশ, তাহলে এবার বলুন! মানে, ঘটনাটা খুলে বলুন। কেন দলিল চুরি করা প্রয়োজন? কোথা থেকে চুরি করতে হবে, কাকেই বা বাঁচাতে? আমার কাজটা নেওয়া নির্ভর করছে পুরো তারই ওপর।

—সে সব বলছি। তার আগে—ব'লে কোটের পকেট থেকে ব্যাগ বের ক'রে তা থেকে বাঁ হাতে একটি একটি করে পাঁচটা একশো টাকার নোট গুণে টেবিলের ওপর রাখল বেন মোজেস। তারপর ব্যাগটা পকেটে রেখে নোটগুলি এগিয়ে দিল আমার দিকে।

—টাকাটা আপাতত আপনার হাতেই থাক। ঘটনা, ইতিহাস সব শুনে নিই আগে—তাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলাম আমি সব শুনে কাজটা নিতে পারলে তবেই তো দেবেন টাকাটা!

কথাটা শুনে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল বেন মোজেস। নোটসুদ্ধ বাড়ানো হাতটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, সে-কথা ঠিক। তাহলে আগে শুনুন—

আর তারপর বলতে শুরু করল বেন মোজেস—

—কলকাতার ইহুদিদের সম্বন্ধে আপনি কোন খবর রাখেন কিনা জানি না। তবে না-রাখলেও একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন, স্বর্গত স্যর আব্রাহাম মোজেস একসময়ে কলকাতার ইহুদিদের মাথা

ছিলেন। ইহুদিরা ব্যবসায়ীর জাত এবং স্যর আব্রাহাম মোজেসও ব্যবসায়ী ছিলেন—বেশ সম্পন্ন ব্যবসায়ী। কলকাতার ইহুদিসমাজে মোজেসের চেয়ে অনেক ধনী, এমন কি কোটিপতি ব্যবসায়ী আরো অনেক ছিলেন, কিন্তু স্যর আব্রাহাম মোজেসের মতন সম্মানিত আর কেউ ছিলেন না, তার কারণ তাঁর মতন পণ্ডিত, ধর্মোৎসাহী পরোপকারী মানুষও আর কেউ ছিলেন না সমাজে।

—স্বর্গত স্যর আব্রাহাম মোজেস কে ছিলেন আপনার? আমি প্রশ্ন ক'রে উঠলাম—দম নেবার জন্যে বেন মোজেস থামতেই।

—আমার পিতৃদেব। তাঁর দুই বিয়ে—দুই স্ত্রীরই একটি ক'রে ছেলে।

দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান আমি। প্রথম স্ত্রীর সন্তান হলেন আমার বড় ভাই আইজাক মোজেস।

—দুটি মাত্র ভাই আপনারা! তারপর—

—আমি যখন বিলেতে, তখন বাবা হঠাৎ মারা যান। মারা যাবার আগে আমার সম্বন্ধে কতকগুলি বাজে খবর শুনে বাবা তাঁর সম্পত্তি থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রে যান। ফলে, বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে বিলেত থেকে ফিরে এসে আমি দেখতে পাই আমার অবস্থা কপর্দক-শূন্য। ব্যারাকপুরের পৈতৃক বাড়িতে যে এসে উঠেছি, সেখানে আমার কোন অধিকার নেই, রয়েছি নেহাতই দাদার অনুগ্রহে। ওরকম অবস্থায় আর থাকা উচিত নয় মনে ক'রে তাড়াতাড়ি একটা চাকরি যোগাড় ক'রে আমি বম্বে চ'লে যাই।

—কী বাজে খবর আপনার বাবা শুনেছিলেন আপনার সম্বন্ধে, সেটা বলতে কোন বাধা আছে আপনার?

—না। বাবা শুনেছিলেন, আমি নাকি বিলেতে গিয়ে খ্রীষ্টান হ'য়ে গিয়েছি। কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণই মিথ্যে।

—হুঁ, তারপর?

—আমার মা তখন বেঁচে। মাকে আমার সঙ্গে ক'রে বম্বে নিয়ে যাবার জন্যে আমি চেষ্টা করি, কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হলেন না।

আসলে, আমি যে খ্রীষ্টান হইনি সেটা বিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারি নি মাকে। মুখে অবশ্য মা সে-কথা একবারও বলেন নি। বলেন যে, বাবার স্মৃতি-জড়ানো ব্যারাকপুরের ওই বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকলে তিনি নাকি শান্তি পাবেন না।

—আর আপনার দাদা? তিনিও কি বিশ্বাস করেন না যে, আপনি খ্রীষ্টান হন নি?

—কী ক'রে করবেন? যতদূর জানতে পেরেছিলাম, ব্যাপারটা তাঁরই রটনা!

—কেন? পিতৃ-সম্পত্তি থেকে আপনাকে বঞ্চিত করার জন্যে?

—তা ছাড়া আর কী কারণ হতে পারে?

—আপনি চ্যালেঞ্জ করেননি তাঁকে?

- করব ভেবেছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম আমার চেয়ে তাঁর কথাই মা বেশি বিশ্বাস করছেন, তখন মায়ের ওপর ভীষণ একটা অভিমান হয়েছিল আমার!

—আপন ছেলের চেয়ে সৎ-ছেলের কথা বিশ্বাস করলেন আপনার মা?

—করবেন না কেন? ঐ সৎ-ছেলেকে যে মা নিজের হাতে মানুষ করেছিলেন। অনেকে তো দাদাকে মা-র ছেলে ব'লেই জানে আজ পর্যন্ত। মায়ের বিশ্বাসও দাদার উপর ছিল অগাধ।

—তারপর বলুন।

-- পিতৃ-সম্পত্তি থেকে ফাঁকি প'ড়ে এবং সেই সঙ্গে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে সেই যে আমি চাকরি নিয়ে বম্বেতে চলে গেলাম, তারপর আর কোন সম্পর্কই রাখলাম না কলকাতার সঙ্গে। বেশ কয়েক বছর এইভাবে কেটে যাওয়ার পর জীবনে আমার একটা মস্ত দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

—কী রকম?

—বম্বেতে যে ফার্মে আমি কাজ করতাম, তার মালিকও হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাঁর বিধবা স্ত্রী এক মাড়োয়ারির কাছে ফার্মটা বেচে দিলেন।

নতুন মালিক এসেই তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল অফিসারদের মধ্যে বেশি মাইনে-পাওয়া আমাদের কয়েকজনকে। সেই উদ্দেশ্যেই বোধহয় একদিন অত্যন্ত অপমানজনক কথা বলল নতুন মালিক আমাকে! আমি সহ্য করতে না পেরে প্রথমে নাকে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলাম তার অফিসের মধ্যেই। তারপর সেই ঘুষি খেয়ে মালিক দারোয়ান ডাকবার চেষ্টা করতেই তার গলা টিপে ধরলাম আমি, আর ছাড়লাম একেবারে ক্ষমা চাইবার পর। কিন্তু তারপর মালিক আর আমায় ছাড়ল না। চাকরি তো গেলই, অফিসের মধ্যে দাঙ্গা করবার, মানুষ খুন করবার অপরাধে জেল হ'য়ে গেল আমার তিন বছরের। আসল শাস্তিটা অবশ্য শুরু হ'ল জেল থেকে বের হবার পর। হাজার চেষ্টা ক'রেও কোথাও দ্বিতীয় একটা চাকরি আমি পেলাম না! একবার মনিবকে ঘুষি মেরে ও খুন করার চেষ্টা ক'রে যে জেল খেটেছে তাকে ভরসা ক'রে চাকরি দেবে কে?

—তারপর?

—তারপর এক সময়ে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম ব্যবসার। এক পাঞ্জাবীকে অংশীদার ক'রে শুরুও করলাম ব্যবসা। দিনরাত পরিশ্রম ক'রে যখন প্রায় দাঁড় করিয়ে এনেছি ব্যবসা, তখন একদিন সেই পাঞ্জাবী অংশীদারটি ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে উধাও হ'য়ে গেল! বেশির ভাগ টাকাই ছিল ধার করা। ব্যবসা তো ডুবলই, পাঞ্জাবী অংশীদারটি ফেরার হ'তে উল্টে প্রচুর দেনা চেপে গেল আমার ঘাড়ে। বছর দুয়েক কাটালাম কোনগতিকে, তারপর কোনদিন অর্ধাহারে, কোনদিন অনাহারে থেকে আর পাওনাদারদের হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে, শেষে একদিন চরম দুরবস্থায় সব অভিমান ভুলে চিঠি লিখলাম মাকে কলকাতায়।

—কী উত্তর দিলেন আপনার মা?

—উত্তর···হ্যাঁ, উত্তর একটা পেলাম বটে, তবে সেটা মায়ের কাছ থেকে নয়!

—দাদা উত্তর দিলেন চিঠির?

—হ্যাঁ, দাদাই বলতে পারেন, তবে তলায় সই দাদার এটর্নির। আর তাতে লেখা যে, ঠিকানা না-জানার জন্য আমার মায়ের মৃত্যুর খবর আমাকে আগে জানানো যায়নি। ঠিকানা পেয়ে এখন জানানো হচ্ছে যে, গত পঁচিশে জানুয়ারি, উনিশ শো একষট্টি সালে আমার মা—লেট আব্রাহাম মোজেসের দ্বিতীয় পত্নী রাচেল মোজেস হার্টফেল ক'রে মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর ব্যাঙ্কের চার হাজারের ওপর টাকার একমাত্র ওয়ারিশন এখন নাকি আমি এবং নিজের পরিচয় সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণাদি পাঠিয়ে সেই সঙ্গে তাঁকে ক্ষমতা দিলে কিম্বা স্বয়ং তাঁর কলকাতার অফিসে উপস্থিত হ'তে পারলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা আমার পাবার ব্যবস্থা নাকি এটর্নি ক'রে দিতে পারেন।

—তার মানে, আপনার মা মারা গিয়েছেন আজ এক মাসও পুরো হয়নি?

—পরশুদিন পুরো হবে।

—কী নাম এটর্নি ভদ্রলোকের?

—জি সি মণ্ডল ফার্মের বি. এন. ঘোষ।

—হুঁ, তারপর বলুন।

—এটর্নির চিঠিখানা পাবার পর একজনকে সেটা দেখিয়ে এবং ফিরে গিয়ে তাকে ডবল টাকা ফেরত দেবার কড়ার ক'রে তার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে, তাড়াতাড়ি কলকাতা চলে এলাম আমি। হাজির হলাম গিয়ে ঐ এটর্নির অফিসে। তারপর এটর্নির সাহায্যে ব্যাঙ্কের ওই চার হাজারের মতন টাকা উদ্ধার হ'য়ে আমার হাতে না-আসা পর্যন্ত কোন কথা আমি তুললাম না। তারপর টাকাটা যেদিন হাতে পেলাম, সেদিন জিগ্যেস করলাম যে, আমার মায়ের ব্যাঙ্কের অত টাকা কেমন ক'রে খরচ হ'ল? আর মায়ের সেই রত্নহারটাই বা গেল কোথায়?

—মায়ের ব্যাঙ্কের অত টাকা, মানে?

—ব্যারাকপুরের ওই বাড়ি ও জমি, ব্যবসা এবং সেই সঙ্গে পুরো দুই লাখ টাকা নগদ বাবা দাদাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। নগদ বাকি টাকা -প্রায় লাখ আড়াই—সবই দিয়ে গিয়েছিলেন মাকে।

– আর রত্নহার ?

—একটি রত্নহার ছিল মায়ের। বাবা দিয়েছিলেন। বেশ কয়েকটা বড় বড় হীরে ও চুনী ছিল সেই হারে। তখনকার দিনেই এক দুঃস্থ মহারাজার কাছ থেকে মস্ত দাঁওয়ে সেটা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন বাবা। এখন সেটার দাম খুব কম ক'রেও দেড় লাখ টাকা তো হবেই।

—এটর্নি কী উত্তর দিলেন ?

—কিছুই বলতে পারলেন না। মানে, বললেন সে-সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। আমি আমার দাদাকে জিগ্যেস করলে হয়তো কিছু জানতে পারব। শুনে এটর্নি-অফিস থেকে বেরিয়ে আমি সোজা গিয়ে হাজির হলাম অফিসে।

–অফিসে ! কোন্ অফিসে ?

– অফিসে মানে, একসময় যেটা বাবার অফিস ছিল এবং এখন দাদার হয়েছে। বাবা বেঁচে থাকতে সেটাকে শুধু অফিস ব'লেই উল্লেখ করা হ'ত আমাদের বাড়িতে। অভ্যেসটা দেখছি এখনো রয়ে গিয়েছে !

–কী নাম, আপনাদের অফিসের ?

—এ. মোজেস অ্যাণ্ড কোম্পানী।

- ঠিকানা ?

– মিশন রো-র গ্যালব্রেথ হাউস-এর দোতলায়।

– ব্যবসাটা কীসের ?

—চা ও পাটের দালালির।

—হুঁ, তারপর বলুন।

– দাদা আমাকে দেখে বেশ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। তারপর আমার প্রশ্ন শুনে বললেন যে, মায়ের রত্নহারটা নাকি ভাল দাম পাওয়া যেতে বেচে দেওয়া হয়েছিল বাবা বেঁচে থাকতেই। আর মায়ের ব্যাঙ্কের টাকার ব্যাপারে বললেন যে, সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। মায়ের নামেই টাকা ছিল ব্যাঙ্কে, মা-ই চেক কেটেছেন, টাকা তুলেছেন, খরচ করেছেন। তবে অনেক টাকাই নাকি খরচ করেছেন তাঁর চোখের

অসুখের চিকিৎসার জন্য। দানও নাকি কম করেন নি। বাবার মতনই গোঁড়া ও ধর্মোৎসাহী মানুষ ছিলেন তিনিও। ইহুদিদের ফিরে পাওয়া মাতৃভূমি, ইজরায়েল-এ বসবাস করতে যাবার খরচার জন্য কলকাতার গরীব ইহুদি যে এসে ধরেছে, তাকেই তিনি মুক্ত হস্তে সাহায্য করেছেন।

—কথাটা বোধহয় আপনার বিশ্বাস হলো না?

—না। রত্নহার বিক্রির ব্যাপারটা তো একেবারেই নয়।

—সে কথা বললেন আপনার দাদাকে?

—হ্যাঁ।

—দাদা কী বললেন?

—বললেন, মানে, জিগ্যেস করলেন, আমি নিজে থেকেই যাবো, না আমাকে অফিস থেকে জোর ক'রে বের ক'রে দেবার জন্য দারোয়ান ডাকবার প্রয়োজন হবে?

—তারপর?

—নিজেই চলে এলাম আমি। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা গেলাম মায়ের ব্যাঙ্কে?

—কোন্ ব্যাঙ্কে?

—ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্ক। সেখানে অনেক ব'লে ক'য়ে, এবং আমি মায়ের একমাত্র ওয়ারিশন তাদের জানাথাকায়—মায়ের অ্যাকাউন্টের গত বারো বছরের হিসেবটা কয়েকদিনের মধ্যেই আমার নামে ক'রে দিতে রাজি করালাম তাদের। তারপর, সেই হিসাবটা হাতে পেয়ে দেখি যে, বেশির ভাগ চেকই মা কেটেছেন দাদার নামে। দশ হাজার, পনেরো হাজার, বিশ হাজার—একটা তো পুরো পঞ্চাশ হাজারের। সব মিলিয়ে দু লাখের ওপর দাদাকেই চেক কেটে দিয়েছেন মা। তখন একজন উকিলের কাছে সব বললাম। তিনি শুনে বললেন যে, দাদা টাকাগুলি মায়ের কাছ থেকে হাতিয়েছেন বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তা নিয়ে মামলা ক'রে কোন ফল হবে না। টাকাগুলি মা তাঁকে স্বেচ্ছায় দিয়েছেন কিম্বা তাঁর নামে চেক লিখে দিয়েছেন, তুলে এনে তাঁকে দেবার জন্যে—

এর যে-কোন একটা কথা দাদা দাঁড়িয়ে আদালতে বললেই মামলা নাকচ হ'য়ে যাবে।

—ভুল বলেননি উকিল!

—ভুল বলেননি সেটা বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম, নগদ টাকা আর দাদার কাছ থেকে আদায়ের কোন উপায় নেই। এখন রত্নহারটা যদি কোনভাবে আদায় করা যায়।

—রত্নহারটা যে সত্যিই আপনার বাবার আমলে বিক্রি হ'য়ে যায়নি, সেটা জানছেন কী করে?

—প্রথমত, আমি বিলেত থেকে আসবার পর একদিন একটা কথায় মা আভাষ দিয়েছিলেন, ঐ হারটা আমি বিয়ে করলে আমার বৌকে দেবেন ব'লে। দ্বিতীয়ত, যদি বাবার আমলে বিক্রি হ'ত তাহলে সে-কথা আমাদের যিনি জুয়েলার ছিলেন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন বাবার, তিনি কি ব্যাপারটা জানতেন না? তাঁর সঙ্গে কি একবার পরামর্শ করতেন না বাবা?

—তাঁর কাছে কি খবর নিয়েছেন আপনি?

—হ্যাঁ। তাই আমার ধারণা, রত্নহারটা ব্যারাকপুরের ঐ বাড়িতেই আছে।

—কেন, আপনার বম্বে থাকার সময়ও তো বিক্রি হয়ে থাকতে পারে সে হার?

—কী ক'রে বলুন? বাবা বেঁচে থাকতে যে জিনিস মা ব্যাঙ্কের ষ্ট্রং-রুমে পর্যন্ত রাখতে দেন নি, বাবার মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি সেই হার কি কখনো বেচা সম্ভব মায়ের পক্ষে? কখনই না। বেচবেনই বা কেন বলুন? টাকার প্রয়োজনে নিশ্চয়ই নয়, কেননা টাকা তো তাঁর ব্যাঙ্কে যথেষ্ট ছিল। আর তাও যদি বেচে থাকেন, অত দামী গয়নার দাম কেউ নগদে দেয় না, উনিও নিশ্চয়ই নেন নি। কিন্তু সে রকম কোন বড় টাকা দূরে থাক, একটা আধলারও জমার হিসেব নেই মায়ের অ্যাকাউন্টে। তাছাড়া, মা হারটা বিক্রি ক'রে থাকলে, দাদা তো

আমায় সে-কথাই বলতেন—বাবার আমলে বিক্রি হয়েছে বলবেন কেন? না, ঐ হার নিশ্চয়ই দাদার কাছে আছে।

—আপনার মায়ের মৃত্যুর পরও তো এই ক'দিনে সে-হার বিক্রি হ'য়ে থাকতে পারে?

—হ'য়ে থাকতে পারে, তবে না-হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি, কেননা ঐ হারটির উপর ভীষণ লোভ ছিল আমার বউদির। আমি বিলেত যাবার আগে দেখতাম, কোন পার্টিতে যেতে হ'লে আমার বউদি ঐ হারটাই মায়ের কাছ থেকে নিয়ে পরতেন। শুধু তাই নয়, তারপর মা না চাইলে ফেরত দিতেন না।

—হুঁ, তাহলে হারটা এখন ওই বাড়িতে থাকাই সম্ভব। আপনাকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করা হ'লে আপনার দাদা ভরসা ক'রে হারটা ব্যাঙ্কেও রাখবেন ব'লে মনে হয় না।

—হারটা ঐ বাড়িতেই আছে বলে আমার ধারণা। আছে কি না নিশ্চয় ক'রে জানতে পারছি না। সেটাই এখন জানতে চাই আমি এবং থাকলে হাতে পেতে চাই।

—তাই এসেছেন আমার কাছে?

—হ্যাঁ।

—হারটা যদি ঐ বাড়িতে থাকে তো কোন্ সিন্দুকে আছে ব'লে আপনার ধারণা?

—হ্যাঁ, নিশ্চিত ধারণা। কাল ব্যারাকপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি দাদার সঙ্গে অফিসে ঐ ব্যবহার করার জন্য দাদার কাছে ক্ষমা চাইবার, চিরকালের জন্য কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে দাদার সঙ্গে শেষ দেখা করবার, আমার জন্মস্থান ও জীবনের অনেক স্মৃতিঘেরা ব্যারাকপুরের বাড়ি একবার দেখবার—একসঙ্গে অনেকগুলি অজুহাত দেখিয়ে। দাদা অবশ্য আমার কথা কতখানি বিশ্বাস করলেন, জানি না। তবে বেশ ভালো ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। তাঁর অনুমতি নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে প্রথমে গেলাম আমি আমার পুরনো ঘরে। দেখলাম, সেটা গুদাম-ঘর হয়েছে বাড়ির। দাদার পুরোনো ঘরটা হয়েছে

বউদির নিজস্ব একটা বসবার ঘর। আর মায়ের অর্থাৎ, বাবা-মায়ের ঘরটায় বাস করছেন দাদা-বউদি। মায়ের ঘর দেখবার নামে সে-ঘরের সংলগ্ন যে-ঘরে সিন্দুক ও পোশাক-পত্তরের আলমারি থাকতো মায়ের, সে-ঘরেও ঢুকলাম। সেই সিন্দুকও দেখলাম তেমনি রয়েছে।

—ওই সিন্দুকেই রত্নহারটা রয়েছে ব'লে আপনার ধারণা?

—হ্যাঁ। মা ওই সিন্দুকেই রাখতেন। ইতিমধ্যে বিক্রি না ক'রে থাকলে—যার সম্ভাবনা খুবই কম—দাদাও হারটা ওই সিন্দুকেই রাখবেন। রত্নহারের মতন দামি জিনিস রাখবার অন্য কোন নতুন জায়গা তো দেখলাম না বাড়িতে।

—আপনার বউদির গয়না-পত্তর কোথায় থাকে?

—আগে তো ব্যাঙ্কে থাকতো। শুধু বউদির নয়, মায়েরও—মানে, ঐ রত্নহারটি ছাড়া।

—আপনার মায়ের অন্যান্য গয়না-পত্তর কী হলো?

—বাবার মৃত্যুর পর সে-সব গয়না বউদিকে দিয়ে দিয়েছিলেন মা। আমি তখন ফিরে এসেছি বিলেত থেকে। আমি শুনেই আপত্তি করেছিলাম। হিন্দু বিধবাদের মতন মা আর কোনদিন গয়না পরবেন না, ভাবতে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল আমার। মা কিন্তু আমার আপত্তির কারণটা একেবারে ভুল বুঝেছিলেন, আর তাই আমি ভাল একটা বিয়ে করলে আমার বউকে ওই গয়নার পাঁচগুণ দামের গয়না দেবেন ব'লে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। ভাল বিয়ে ব'লতে খ্রীষ্টান-ধর্ম ছেড়ে ইহুদি মেয়ে বিয়ে এবং পাঁচগুণ দামের ব'লতে ঐ রত্নহারটা বোঝাতে চেয়েছিলেন তখন। অবশ্য, তাই নিয়ে তখন আর কোন আলোচনা আমি করিনি। মাকে নানাভাবে রাজী করিয়ে আমার সঙ্গে বম্বে নিয়ে যাবার কথাই ভেবেছিলাম শুধু সে সময়।

—ওই সিন্দুক সম্বন্ধে কোন কথা কি সেদিন জিগ্যেস করেছিলেন আপনি আপনার দাদাকে?

—খুবই ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত করিনি।

ব'লে চুপ করল বেন মোজেস। আমি বললাম—তা, আপনার

প্রস্তাবটা এখন কী? পাইপ বেয়ে জানলা দিয়ে ওই ঘরে আমি ঢুকি এবং তারপর ঐ সিন্দুক ভেঙে দেখি রত্নহারটা তার মধ্যে রয়েছে কিনা, এই তো?

—হ্যাঁ। আর যদি থাকে তো সেই রত্নহার যার ন্যায্য পাওনা তাকে অর্থাৎ, আমাকে এনে দিন।

—এতক্ষণ যা বললেন তাতে ব্যাপারটা পুরোপুরি চুরির কেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—মাপ করবেন কাজটা আমার দ্বারা হবে না।

দেখুন, ব্যাপারটা যে চুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু চুরিটা তো আসলে একটা চোবের কাছ থেকেই। যাকে বলে, চোবের ওপব বাটপাড়ি।

—আপনি ঘটনা ও ইতিহাস যা বললেন, তা বিশ্বাস করতে হ'লে, তাই। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, যে-ব্যাপারে আমি এমনিতে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না, সে-ব্যাপাবে আপনার এক তরফা কথা শুনে এতবড়ো একটা কাণ্ড আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেটুকু আমি কারু ক্ষতি না ক'রে, আমার বিবেকের কাছে ঠিক থেকে করতে পারি তা হলো, রত্নহারটা ওই বাড়ির ওই সিন্দুকে রয়েছে কিনা, সেটা দেখে এসে বলতে পারি আপনাকে।

আমার কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল বেন মোজেস। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। তারপর মুখ তুলে বসে বলল—বেশ, তবে সেইটুকুই দেখে এসে বলুন আমাকে। কিন্তু দাদা যেন কিছুতেই টের না পান। যাতে আমি পুলিশ নিয়ে গিয়ে ঐ সিন্দুক খুলিয়ে হারটা বের করবার আগে তিনি সাবধান হ'য়ে হারটা সিন্দুক থেকে সরিয়ে ফেলতে না পারেন।

—সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে ঐ ঘরে ঢোকবার সুবিধে কী রকম এবং সিন্দুকটা কী জাতের, তার ওপর! কীভাবে কাজটা আমি সুষ্ঠু ভাবে করতে পারি, সে সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন?—আমি জিগ্যেস করলাম।

—হ্যাঁ, ভেবেছি। মানে, কাজটা নিজেই করব ব'লে ভেবেছিলাম প্রথমে, কিন্তু তারপরে বুঝলাম যে, আমার সাধ্যে সেটা কুলোবে না—কেননা, পাইপ বেয়ে জানলা দিয়ে ঢোকা ছাড়া গোপনে ওই ঘরে ঢোকার অন্য কোন পথ নেই। পাইপটাও জানলা থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

—কেন, যা বললেন আপনি তাতে পাইপ না বেয়েও, আপনার মায়ের ঘর দিয়েও তো ঢোকা যেতে পারে!

—সে-ঘরে দাদা-বউদি থাকবেন। অবশ্য যে সময়টা কাজের উপযুক্ত অবসর ব'লে ঠিক করেছি—মানে, পরশু শনিবার সন্ধেরাত—তখন দাদা-বউদি কেউই থাকবেন না। কিন্তু তাঁরা যেমন থাকবেন না, তাঁদের অনুপস্থিতিতে বাড়ির চাকর-বেয়ারা অনেক বেশি সজাগ থাকবে। তাদের চোখ এড়িয়ে ঢোকা মুস্কিল হবে।

—পরশু শনিবার কোথায় যাবেন আপনার দাদা-বউদি? মানে, কতক্ষণের জন্যে?

—তিন-চার ঘণ্টার জন্যে তো নিশ্চয়ই। কেননা, যাবেন ক্লাবে। মায়ের মৃত্যুতে এতদিন বন্ধ ছিল যাওয়া। এই শনিবার কা একটা ফাংশন আছে ব্যারাকপুর ক্লাবে। বউদিকে নিয়ে যাচ্ছেন ব'লে আমার সামনেই ফোনে একজনকে বললেন সেদিন দাদা।

—আচ্ছা, পাইপ বেয়ে না হয় উঠলাম। তারপর পাইপ থেকে জানলায় যাব কী করে? কার্নিস আছে নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ।

—আর জানলাটা? কাঁচের না কাঠের? ভেতরে শিক দেওয়া না খোলা?

—কাঁচের। ভেতরে শিক দেওয়া।

—তার মানে ভাঙতে হবে কাঁচ। বেঁকাতে হবে শিক। শিকটা অবশ্য আবার সোজা ক'রে দিয়ে আসতে পারবো। ভাল করে লক্ষ্য না করলে কিছু বোঝা যাবে না। কিন্তু ভাঙা কাঁচের কী হবে? আচ্ছা, ক-পাল্লার জানলা?

—দুই।

—শুধু খিলের ব্যবস্থা, না ছিটকিনি আছে?

—শুধু খিলের এবং বেশ আল্‌গা। একখানা পোষ্টকার্ড ঢুকিয়ে খুলতে পারবেন।

—খিলটা সেদিন পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন আপনি?

– হ্যাঁ। নিচে বাগানটা দেখবার নাম করে জানলার কাছে গিয়ে।

- বেশ, জানলাটা খোলা গেল কাঁচ না ভেঙেই। চলে আসবার সময় খিলে পাতলা শক্ত সুতো জড়িয়ে তারপর পাল্লা দুটো টেনে বন্ধ ক'রে দিয়ে তার আল্‌গা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে সেই সুতোয় ধ'রে টেনে তুলে ফের লাগিয়ে দেওয়া যাবে খিল। শুধ্‌ তাই নয়, সুতোটাও বের ক'রে আনা যাবে। আচ্ছা. এবার সিন্দুকের কথা বলুন। কী মেকের? চাবির, না ডায়েল-এর? না, দুই-ই?

—লয়েডস্‌ কোম্পানীর সিন্দুক। বাইরে একটা চাবি, ভেতরের ডালায় দুটো ডায়েল।

—'মাষ্টার কী' দিয়ে খোলবার চেষ্টা করব বাইরের ডালা। লয়েডস্‌-এর হলেও পারব। ভেতরের ডালার ডায়েল দুটোর নম্বর জানেন? মানে, কাঁটা কী কী নম্বরে রাখতে হবে?

– একটা আঠারো ব'লে মনে আছে। অন্যটা মনে নেই।

—একটার কাঁটা আঠারোয় রেখে তারপর ডালায় কান রেখে অন্যটার কাঁটা ধীরে ধীরে ঘোরালেই হবে! সঠিক নম্বরে এলেই আওয়াজ পাওয়া যাবে চাবি খোলবার। যাক, সিন্দুকের ব্যবস্থা হলো, এখন ব্যারাকপুরের বাড়ির প্ল্যানটা আমার জানা দরকার। কাগজে একটু এঁকে দেখান তো।

এঁকে দেখাবার আর প্রয়োজন হলো না। তার কোটের বাঁ পকেট থেকে এঁকে আনা একটা কাগজ বের ক'রে বেন মোজেস আমার সামনে এগিয়ে ধরলেন। কম্পাউণ্ডের দেয়াল কোথায় টপকানো সুবিধে, পাইপটা সেখান থেকে কতদূরে, তারপর পাইপ দিয়ে উঠে কোন্‌ জানলা দিয়ে ঢুকতে হবে--সবই কাগজে দেখানো রয়েছে তীর চিহ্ন দিয়ে।

প্ল্যানটার মধ্যে বেন মোজেসের মায়ের শোবার ঘর সংলগ্ন আরেকটা চৌখুপী দেখে জিগ্যেস করলাম—এটা কী?

—বাথরুম।

—বাথরুম যখন তখন সাফ করার দরকার হয়। সাফ করার জমাদার আসে কোথা দিয়ে? শোবার ঘর দিয়ে নিশ্চয়ই নয়?

—না। তাদের যাতায়াতের জন্যে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি রয়েছে বাইরে দিয়ে।

—সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠলে হয় না? তারপর আপনার মায়ের শোবার ঘর দিয়ে ঢুকলে হয় না সিন্দুকের ঘরে?

—ঢোকা যেতে পারে, তবে কাজটা কঠিন হবে।

—কেন?

—প্রথমত, সেই সিঁড়ি উঠেছে চাকর-বেয়ারাদের কোয়ার্টার্সের সামনে দিয়ে। ইলেকট্রিক আলোর একটা পোস্ট রয়েছে সেখানে। বেয়ারাদের বউয়েরা সেই আলোয় তাদের কোয়ার্টারে রান্না করে। ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠলে তাদের কারুর চোখে প'ড়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। তাছাড়া ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠলে ভাঙতে হবে পরপর দুটো ছিটকিনি দেওয়া দরজা! প্রথমটা সিঁড়ি থেকে ঢোকবার; দ্বিতীয়টা বাথরুম থেকে শোবার ঘরে যাবার। না, ওদিকের চেয়ে এই পাইপের দিকটাই সুবিধে—একেবারে অন্ধকার থাকে—বাগানে বেড়াবার নাম ক'রে ভাল ক'রে ঘুরে দেখে এসেছি।

—হুঁ। ব'লে আমি একটু ভেবে নিলাম চট ক'রে, তারপর বললাম—এই কাগজটা—আঁকা প্ল্যানটা রেখে যান! আর টাকাটাও এবার দিতে পারেন। টাকার কথা বলতে এতক্ষণে হুঁশ হলো বেন মোজেসের। খেয়াল হলো, কথা বলার উত্তেজনায় নোটগুলো কখন যেন হাতে পাকিয়ে প্রায় একটা পিং পং-এর নিটোল বল তৈরি ক'রে ফেলেছেন তিনি। হুঁশ হ'তেই তাড়াতাড়ি নোটগুলো খুলে মেলে সেগুলি টেবিলের ওপর ফেলে হাত দিয়ে ইস্ত্রি করতে করতে বললেন—না, কোন ক্ষতি হয়নি নোটগুলির। বলেন তো, বদলে দেই।

—থাকলে তাই দিন। আমি হেসে বললাম – কোঁচকানো নোট আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। মানে, বাড়তি যদি সঙ্গে থাকে আপনার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রয়েছে! বলতে বলতে পকেট থেকে আবার ব্যাগ বের করলেন বেন মোজেস। বের করে বললেন—মায়ের ব্যাঙ্কের সেই চার হাজার টাকা থেকেই এই সব খরচ করছি, বুঝতেই পারছেন। এই টাকায় কোন কাজ হবে না আমার। তবে যদি রত্নহারটা পাই তো সেটা বেচে ধার-দেনা শোধ ক'রে নতুন করে জীবন আরম্ভ করবার একটা চেষ্টা করব আবার!

পাঁচটা নোট আবার বের করে এগিয়ে ধরল বেন মোজেস আমার দিকে। টাকাটা নিয়ে ইণ্টার-কম্যুনিকেশনের সুইচটা দু-বার ঘুরিয়ে ডাকলাম আমি এলাকে। 'ইয়েস স্যর!' ব'লে এলা সাড়া দিতে বললাম – বেন মোজেসকে শুনিয়ে বললাম – শনিবার বিকেলে কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকলে ক্যানসেল ক'রে দাও – আমি ব্যস্ত থাকব। আর রসিদ বইটা নিয়ে এস। একটা রসিদ কেটে দিতে হবে মিঃ মোজেসকে।

—না, রসিদপত্তর কিছু আমার চাই না। শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন বেন মোজেস—রত্নহারের খবরটা কখন পাব শুধু বলুন?

—আশা করছি রবিবার সকালেই হয়তো খবরটা দিতে পারবো আপনাকে! আমি বললাম—খবর কোথায় দেবো, বলুন।

ঠিকানা একটা বলল বেন মোজেস। ব'লে বললেন– বেন মোজেস নামে কিন্তু সেখানে নেই আমি। সেখানে আমার নাম স্যামুয়েল জুডা। আসলে আমি এখন লুকিয়ে রয়েছি কলকাতায়। দাদা জানেন যে, গতকালই আমি কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছি। তা সেখানে আমার খোঁজ নেওয়ার চেয়ে আমিই আসব বরং আপনার এখানে, রবিবার!

—বেশ, তাই আসবেন। তবে দেরি করবেন না—এই ন-টা নাগাদ। ছুটির দিন তো!

— তাহলে আজ উঠি!

—হ্যাঁ, শুধু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটি সবশেষে করলাম আমি—আমার খবর আপনি কোথেকে পেলেন? কে দিল আপনাকে?

—মিঃ ডেভিড।

—মিঃ ডেভিড! তিনি কে?

—পুরো নাম স্যামুয়েল ডেভিড। মায়ের ব্যাঙ্কের হিসাব দেখে যে উকিলের কাছে গিয়েছিলাম আমি দাদার বিরুদ্ধে মামলা করতে, তিনিই পরামর্শ দিলেন এ ব্যাপারে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আর ঘি তোলার জন্য আঙুল বেঁকাতে আপনি যেমন পারেন, এমন আর কেউ নাকি পারে না কলকাতা শহরে!

বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন বেন মোজেস। বাঁ হাতে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই বের করে প্রথমে আমায় একটা দিয়ে তবে নিজে নিলেন। তারপর দেশলাই নিয়ে বাঁ হাতে কাঠি জ্বালিয়ে প্রথমে ধরিয়ে দিলেন আমারটা, তারপর নিজেরটা ধরালেন। এলা ইতিমধ্যে রসিদ বইটা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল চেম্বারের দরজা খুলে। তাকে দেখে আর একটিও কথা না ব'লে—শুধু টুপিটা মাথা থেকে একবার একটু ক'রে তুলে বিদায় নমস্কার জানিয়ে—প্রথমে আমাকে তারপর দরজার কাছে গিয়ে এলাকে, চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন বেন মোজেস। যে ভাবে এসে ঢুকেছিলেন, সে ভাবে নয়—তার চেয়ে বেশ একটু ক্ষিপ্রগতিতে। অর্থাৎ, মনে কিছুটা হাল্কা হ'য়ে!

অফিসের বাহিরের করিডোরে বেন মোজেসের জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর জিগ্যেস করলাম এলাকে—শুনলে তো সব এতক্ষণ ইণ্টারকম্যুনিকেশন দিয়ে? কেমন বুঝছো?

—শুনে তো সত্যি বলছে ব'লেই মনে হচ্ছে।

—আর চেহারা দেখে?

—দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না!

—কী রকম?

—ওর দুরবস্থার কাহিনীর সঙ্গে ওর চেহারাটা মিলছে না। একেবারেই না! জোর দিয়ে বলল এলা।

—যথা?

—গোঁফ ও গগল্‌স্‌টা একেবারে ফিল্ম-ষ্টার মার্কা। পোশাক-পত্তর বড্ড ছিমছাম।

—হয়তো শৌখিন ছিল আগে। বড়লোকের ছেলে যখন, তখন হয়তো কেন, ছিলই। মায়ের টাকাটা হাতে আসতেই আবার ক'দিন সেই শৌখিনতা মাথা চাড়া দিয়েছে একটু। আর পোশাক-পত্তর যে ছিমছাম দেখছ, তার কারণ সবই নতুন। হাতে টাকা পেয়ে কিনেছে।

—লোকটা বিলেতে গিয়েছিল ব'লে মনে হয় না।

—কেন?

—গেলে এই ঘরে ঢুকে এতক্ষণ টুপি প'রে থাকতো না।

—আর?

—লোকটা ল্যাটা, দেশলাই বাক্স ঠুকল বাঁ হাতে।

—আর কিছু?

—আর জানি না। জানলে আপনার চেয়ারে বসতাম। মোট কথা, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।

—পুলিশের কোনো ফাঁদ ব'লে মনে হচ্ছে কি? আমি জিগ্যেস করলাম—মনে হ'লে, বলো!

—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। কাজটা নিয়ে ভাল করলেন না।

—কী বলছ এলা? সারা মাস মক্কেলের আশায় সকাল-সন্ধে এই চেয়ারে ব'সে ব'সে গায়ে গতরে ব্যথা ধ'রে গেছে আমার। তোমারও তাই। তোমারও বোধহয় এ-মাসের দ্বিতীয় সোয়েটারটা বোনা শেষ হয়ে এসেছে। এই অবস্থায় মাসের শেষাশেষি অফিসে যদি বা একটি মক্কেল এল, তুমি বলছ তাকে ফিরিয়ে দিতে! আজ সপ্তাহের কী বার, জানো?

—থার্স্‌ডে।

—হ্যাঁ, বেস্পতিবার—লক্ষ্মীবার হিন্দুদের। আজ মক্কেল কখনো

ফেরানো যায়? মক্কেল যদি বা ফেরানো যায়, তার নগদ টাকা ফেরানো যায় কখনো? ব্যবসায়ে অলক্ষ্মী লাগবে যে!

—কিন্তু…

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো এলা। যদি পুলিশের ফাঁদ হয় তাহলে ওই টাকাটাই আমাদের লাভ। আমি সিন্দুক ভাঙতে না গেলেই তারা বুঝতে পারবে, আমি ব্যাপারটার আঁচ পেয়ে গিয়েছি। কৈফিয়ৎ নিতে আর তাহলে আসবে না বেন মোজেস।

—কিন্তু ব্যাপারটা পুলিশের ফাঁদ কি না সঠিক জানছেন কী ক'রে—জানলে তবেই তো যাবেন না সিন্দুক ভাঙতে?

—এখনি জানছি। পর পর ফোন করতে হবে অনেকগুলি। বেন মোজেসের কথাগুলি মিলিয়ে নিতে হবে। যদি মিলে যায় তাহলে—

—সব মিলিয়ে জুলিয়েও তো ফাঁদে ফেলতে পারে পুলিশ?

—পারে শুধু দুটো জায়গায় ছাড়া। এক, ঐ ব্যাঙ্ক; দু'নম্বর ঐ এটর্নি অফিস। নাও, ফোনে ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে দাও আমাকে প্রথম।

এক মিনিট বাদে এলা আমার হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিতেই সাড়া পেলাম ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্ক থেকে—কে বলছেন?

—জি. সি. মণ্ডল থেকে এটর্নি বি. এন ঘোষ!

—বলুন, কা করতে পারি আপনার জন্যে?

—দেখুন, আমার মক্কেল বেঞ্জামিন মোজেসের মায়ের অ্যাকাউন্টের যে হিসেবটা আপনারা পাঠিয়েছেন—

—ধরুন একটু! বাধা পড়ল আমার কথায়। তারপর একটু পরে আবার সাড়া এল ফোনে—হ্যাঁ, লেট রাচেল মোজেসের অ্যাকাউন্টের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। আপনাদের দেওয়া হিসেবের মধ্যে দেখছি বারো হাজার টাকার একটি চেক ক্যাশ হয়েছে উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের পাঁচই মার্চ তারিখে। চেকটা কাকে দেওয়া হয়েছে ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তাই বলছিলাম,সেই চেকটা একবার দেখতে পারি?

—সরি। অত পুরনো চেক তো রাখা হয় না, নষ্ট করে ফেলা হয়।

—ও! আচ্ছা, ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে তাকালাম এলার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে। বললাম, ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা তো মিলছে! নাও, এবার গাইড দেখে জি. সি. মণ্ডল ফার্মের এটর্নি বি. এন. ঘোষকে ধরো তুমি। বেন মোজেসের এক আত্মীয়া সাজো। জিগ্যেস কর বেন মোজেসের ঠিকানা। কলকাতায় এসে কোথায় উঠেছে এবং এখনো রয়েছে কিনা?

ফোন গাইড ঘাটতে লাগল এলা। তারপর জি. সি. মণ্ডল অফিস ধ'রে চইল বি. এন. ঘোষকে। তারপর এ-মুখে এলার কথা যা শুনলাম তা এই- আমি মিসেস মার্টিন—এলা মার্টিন কথা বলছি। বেঞ্জামিন মোজেসের আত্মীয়া আমি। শুনেছি, সে কলকাতায় এবং তার ঠিকানা আপনার কাছে পাওয়া যেতে পারে! হ্যাঁ ধরছি- উইলসন হোটেল? আচ্ছা, সেখানে দেখছি আমি! আর আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে বলবেন···ও, আপনার সঙ্গে তার কাজ শেষ হয়ে গেছে? ও, যা হোক, প্রচুর ধন্যবাদ আপনাকে।

রিসিভার নামিয়ে এবার এলা তাকাল আমার দিকে। বলল—এটনি অফিসেও তো মিলছে ঠিকঠাক।

—হুঁঃ। এবার একবার নম্বর দেখে বেন মোজেসের বর্তমান আস্তানা-ফ্যারাডে বোর্ডিং হাউসটা ধরো, কথা বলব আমি।

ফ্যারাডে বোর্ডিং হাউস থেকে সাড়া পেয়ে রিসিভারটা আমার হাতে দিল এলা। রিসিভার হাতে নিয়ে ভারি গলায় ধমক দিয়ে উঠলাম—বিল মরিসন নামে কেউ কাল এসে উঠেছে ওখানে?

—বিল মরিসন? কৈ, না! তটস্থ মেয়েলি গলায় জবাব এল।

—অন্য কোন নামে কেউ?

—আপনি কে কথা বলছেন?

—লালবাজার থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর আহ্‌মেদ।

—ও, গুড্‌ আফটারনুন ইন্‌স্‌পেক্টর। আমি বোর্ডিং হাউসের মালিক মিসেস ফ্যারাডে কথা বলছি। হ্যাঁ, এসেছে দু'জন।

—কী নাম? কী পরিচয়?

—একজন মাদ্রাজি খ্রীস্টান, মিঃ জর্জ। অন্যটি একজন ইহুদি—মিঃ জুডা।

—দাড়ি আছে তাদের কারুর ?

- না, দাড়ি নেই। তবে গোঁফ আছে একজনের।

—কার ?

—মিঃ জুডার।

—কী রকম গোঁফ ? হিটলারি না, স্টালিনের মতন ?

—আজ্ঞে না। বেশ বাহারে। অনেকটা এন্টনি ইডেনের মতন।

—বেঁটে ও মোটা নয় নিশ্চয়ই ?

—আজ্ঞে মিঃ জুডা নয়। তবে মিঃ জর্জ তাই।

—না, মিলছে না। বুঝতে পারছি, আপনার বোর্ডিং এ ওঠেনি শয়তানটা। যাহোক, ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ফোনের বৃত্তান্ত জানালাম এলাকে। তারপর জিগ্যেস করলাম—কী ? এখনও কি সন্দেহ হ'চ্ছে তোমার পুলিশের ফাঁদ বলে ?

—মনে তো হচ্ছে, নয়। কিন্তু···

—না এলা, আর কোন কিন্তু নয়!

আমার জয়রথে চড়ে, অর্থাৎ বছর দুয়েক আগের কেনা নামে ভারি অথচ দামে সস্তা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শেভ্রোলে হাঁকিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম আমরা--আমি ও এলা—তখন আমার হাত-ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। আসবার সময় মোজেসদের বাড়ি—নাম, পাম গ্রোভ—তার সামনে দিয়েই এবং লক্ষ্য ক'রে এসেছি বাড়ির বাইরের আবহাওয়া স্বাভাবিক কিনা!

গতকাল শুক্রবারও দুপুরের দিকে একবার একা এসেছিলাম আমি ব্যারাকপুরে, তবে গাড়িতে নয়—ট্রেনে। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে খুঁজে বের করেছিলাম মোজেসদের বাড়ি! বেশ-বাস ও চেহারাটা অবশ্য তখন একটু পাল্টে এসেছিলাম। গেটের দারোয়ানকে সেধে খৈনি খাইয়ে

ভাব জমিয়ে তারপর জিগ্যেস করেছিলাম—মালি-বেয়ারার কোন চাকরি খালি আছে কিনা এই সাহেব-বাড়িতে! কোন চাকরি খালি নেই শুনেও গেটে বসে গল্প করেছিলাম আরো কিছুক্ষণ।

তারপর গল্প করতে করতে একসময় তেষ্টা পেয়েছিল আমার এবং দারোয়ানের নির্দেশ অনুযায়ী গেটের মধ্যে ঢুকে চাকর-বেয়ারাদের মহলের কাছে টিউবওয়েল-এ গিয়েছিলাম জল খেতে। জল খেয়ে সিধে রাস্তায় ফিরে আসিনি, পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসেছিলাম বাড়ির। দেখে এসেছিলাম ঠিক কোন্ পাইপটা বেয়ে আমাকে উঠতে হবে এবং সেটার অবস্থা কীরকম ভার সইতে পারবে কিনা আমার। প্ল্যানের সঙ্গে মিলিয়ে দোতলার কাঁচের জানলাটাও লক্ষ্য করে এসেছিলাম। পাইপ থেকে একটু দূরে তবে কার্নিস দিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। বাইরে থেকে ঢুকতে কোন্ দেয়ালটা টপকে এসে পড়তে হবে বাগানে ঐ পাইপের কাছাকাছি সেটাও দেখে এসেছিলাম কতটা উঁচু। আর দেওয়ালের ওপর যে ভাঙা-বোতলের কাঁচ বসানো রয়েছে, সেটাও লক্ষ্য করে এসেছিলাম তখন।

টিউব-ওয়েলের জল খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলাম বাথরুমে ওঠবার ঘোরানো সিঁড়িটা। চাকর-বেয়ারারা তখন কেউ ছিল না কাছাকাছি। উপরে বাথরুমের দরজাটাও খোলা ছিল তখন। নিচের থেকেই খোলা দেখা যাচ্ছিল। স্বচ্ছন্দে তখনই ওঠা যেত সিঁড়ি দিয়ে এবং বাথরুমের ভেতরের দরজাটা বন্ধ থাকলেও সেটা নিঃশব্দে ভেঙে ঢোকা যেত শোবার ঘরে। কিন্তু ঢুকে লাভ ছিল না কোন। বেন মোজেসের বউদি বাড়িতে রয়েছেন তখন। নিদ্রা দিচ্ছেন ওই ঘরেই দারোয়ানের হিসাব মতন।

জল খাবার নাম ক'রে ঢুকে এই সব পর্যবেক্ষণ সেরে তারপর ফিরে এসেছিলাম গেট এ। দারোয়ানের সঙ্গে আরেক প্রস্থ খৈনি ডলে খেয়ে পরে আবার খোঁজ খবর নিতে আসব ব'লে চ'লে এসেছিলাম। আর সেই খৈনি খাওয়ার ফলে রাতে ফিরে গিয়ে ঠাণ্ডা দুধ ছাড়া আর মুখে তুলতে পারিনি কিছু! সম্পূর্ণ ছড়ে গিয়েছিল মুখের ভেতরটা।

গতকালের মতন আজকেও আমার চেহারা দেখে চেনবার উপায় নেই। তবে আজ আমার চেয়েও বেশি পরিবর্তন হয়েছে এলার। ষোলোর ওপর আঠারো আনা মেমসাহেব সেজে এসেছে সে। স্কার্ট-ব্লাউজ পরেছে, জুতো পরেছে ছুঁচোল হয়ে আসা লম্বা হিল-এর। চেহারার মধ্যে মোটা করেছে ভুরু, চুলের সিঁথি পালটেছে। মস্ত বড়ো একটা তিল এঁকেছে গালে। চোখের পাতা ঘন ক'রে তার ওপর রিমলেস চশমাও পরেছে একটা জিরো পাওয়ারের।

গাড়িটা চালিয়েও নিয়ে এসেছে এখানে এলাই। আমি পেছনের সীটে বসে এসেছি মেমসাহেবদের ড্রাইভারের মতন। অনেকটা ড্রাইভারের মতনই পোশাক-আশাক আমার। পরনে খাঁকি শার্ট-প্যাণ্ট আর পায়ে একেবারে ক্যাম্বিসের জুতো—পাইপ বেয়ে ওঠার সুবিধের জন্য। ঘরের মধ্যে ঢোকার পর যাতে চলা ফেরার কোন আওয়াজ না হয়, সেজন্যও বটে!

খালি পায়ে পাইপ বেয়ে উঠতে পারলে ওঠার আরো সুবিধে হ'ত বটে, কিন্তু যা খরখরে পাইপের গা, নির্ঘাৎ ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে যেত। আর তাতে পায়ের ছাপও পড়ে যেত, ছাপও রেখে আসতে হ'ত। শুধু মোজা পরে ওঠবার চেষ্টা করলেও তাই। খরখরে পাইপের গায়ে নির্ঘাৎ ছিঁড়ে গিয়ে সেই একই অবস্থা দাঁড়াতো।

ঘড়িতে পৌনে আটটা দেখেই গান্ধীঘাট থেকে বেরিয়ে প'ড়ে গাড়ি ক'রে ষ্টেশনের দিকে চলে এলাম আমরা। একটু দূরে গাড়িতে এলাকে রেখে এক ডাক্তারখানায় গিয়ে টেলিফোন করলাম আমি ব্যারাকপুর ক্লাবে। ব্যস্তভাবে খোঁজ করলাম মিষ্টার অ্যাণ্ড মিসেস আইজাক মোজেস এসে পৌছেছেন কিনা। তারপর এসেছেন শুনেও ডাকতে বারণ করলাম তাঁদের। বললাম, না থাক, ডাকতে হবে না। আমি তো এখনি আসছি ক্লাবে।

ব্যস, ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এসে আবার উঠে বসলাম গাড়িতে। এলাকে বললাম—অল্ ক্লিয়ার! চলো! নামিয়ে দাও ঐ মোড়ে। তারপর যেমন বলেছি, মনে রাখবে। হুবহু তেমন করবে!

মোজেসদের বাড়ির শ' দেড়েক গজের মধ্যে পৌঁছেই এলা গাড়ি থামাল। আমি নেমে গাড়ির ইঞ্জিনের তেল যাবার পাইপটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলাম মাঠে—মাঠ দিয়ে পেছন দিক দিয়ে এসে বাগানের ওই দেওয়ালের কাছে পৌঁছোবার জন্য।

এলাও নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আমার নির্দেশ মতন হাটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল মোজেসদের বাড়ির গেটের দিকে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খানা-খন্দ পেরিয়ে মোজেসের বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে হাজির হলাম আমি। দেওয়ালের ওপর দিয়ে দেখলাম বাড়ির দোতলাটা প্রায় অন্ধকার। জন-প্রাণী কারুরই অবশ্য থাকবার কথা নয় এখন দোতলায়—বেন মোজেসের কথা অনুযায়ী।

কোথায় দেওয়ালটা টপকাবো, সেটা ঠিক ক'রে নিশানা দেওয়া ছিল আমার কালই। ভাঙা কাঁচের টুকরো সেখানে একটু কম। জায়গাটায় পৌঁছে মোটা চটের যে খণ্ডটা সঙ্গে এনেছিলাম, সেটা ভাঁজ ক'রে আগে পেতে দিলাম ভাঙা কাঁচের ওপর। তারপর তার ওপরে দস্তানা পরা দু'হাত দিয়ে চাপ দিয়ে এক ঝট্‌কায় উঠে গেলাম মাটি থেকে। শরীরের ভারে দস্তানা ও মোটা চটের মধ্যে দিয়েও দু'হাতের তালুতে যেন কেটে বসতে লাগল ভাঙা কাঁচ। যন্ত্রণায় টনটন করতে লাগল হাত দুটো। সেই অবস্থায় আবারও সেই হাতের ওপর চাপ দিয়ে এক ঝট্‌কায় ডান পা টা তুলে ফেললাম দেওয়ালের ওপর। তারপর বাঁ পা টা। তারপর প্রায় অবশ হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়লাম ধপ করে ভেতরের বাগানে। মাটিতে পড়ে বেশ কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইলাম। কান পেতে শুনতে লাগলাম কোন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। চাকর-বেয়ারা মহল থেকে কিছু কথাবার্তা শোনা গেল। একজন ডাকছে আরেকজনকে—এক মেম-সাহেবের গাড়ি ঠেলবার জন্য। বলছে যে বকশিশ মিলবে। আর যদি বকশিশ আদায় করতে হয় তবে যেন গোড়ায় কেউ গাড়ি কিছুক্ষণ জোরে না ঠেলে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে রাখছে আগে থেকে।

বেয়ারাদেরগলার আওয়াজ গেটের দিকে মিলিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি

উঠে গিয়ে পাইপের কাছে দাঁড়ালাম আমি। একবার ওপরের দিকে দেখে নিয়ে তারপর সময় নষ্ট না ক'রে পাইপ বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। দোতলার কার্নিস পর্যন্ত পৌঁছে তারপর রীতিমত বেগ পেতে হলো কার্নিশটা পেরোতে। দেওয়াল থেকে বেশ কিছুটা বাইরের দিকে বের করা কানিসটা। কার্নিসের তলার অংশের পাইপ ছু-পায়ের মধ্যে জোরে চেপে ধ'রে হাত বাড়িয়ে ওপরের অংশের পাইপটা ধরতে গিয়ে আরেকটু হ'লেই উল্টে গিয়েছিলাম, আর সেই সঙ্গে হড়কে গিয়েছিল পা! যাক, শেষপর্যন্ত তো কার্নিসের ওপর ওঠা গেল। নামবার সময় তো বেগ পেতে হবে আবার এবং আরো বেশি। কিন্তু সে চিন্তা এখন নয়, পরে। এখন কাজ জানলার কাছে গিয়ে পৌঁছোনো। চওড়া কার্নিস দিয়ে দেওয়াল ধ'রে হেঁটে জানলার কাছে গিয়ে পৌঁছোতে কষ্ট হলো না একটুও। তারপর জানলার শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে নিচে চতুর্দিককার চেহারাটা একবার দেখে নিয়ে পকেট থেকে টর্চটা বের করলাম। টর্চের আলোয় ঘরের ভেতরটা একবার দেখে নেবার জন্য টর্চটা জ্বালিয়ে জানলার কাঁচে ধরলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না কিছু - মোটা পর্দা ঝুলছে জানলার ও-পাশে। জানলার ছু-পাল্লার ভাগটা শুধু দেখতে পেলাম টর্চের আলোয়। টর্চটা রেখে পকেট থেকে নরম টিনের লম্বা একটা পাত বের করলাম, ঢুকিয়ে দিলাম সেই ভাগের জায়গায়। দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে তুলতে লাগলাম পাতটা। এক জায়গায় এসে আটকে গেল খিলে লেগে। পাতটা ধ'রে তারপর একটু জোর দিতেই উঠে এল খিলটা। হাত গলিয়ে ঠিক মতন ধরতে না পারলে খিল পড়ার আওয়াজটা কতদূর পৌঁছোবে কে জানে! জানলার পাল্লা ছুটো আস্তে আস্তে ফাঁক করছি আর খিলটাও পাতের ওপর ক্রমশ পিছিয়ে সরে যাচ্ছে। আর একটু সরলেই বুঝি এবার পড়ে যাবে সশব্দে! যা হোক, হাতটা কোনরকম গলবার মতন ফাঁক হতেই হাত ঢুকিয়ে ধ'রে ফেললাম খিলটা। তারপর বগল পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে নামিয়ে দিলাম সেটা নিঃশব্দে। পাতটা রেখে পর্দা সরিয়ে এইবার টর্চের আলো ফেলতেই ঘরের ভেতরটা নজরে পড়ল। ভেতরের দিকের

দরজাটা হয় ভেজানো কিম্বা বন্ধ। সিন্দুকটা রয়েছে সেই দরজার উল্টোদিকের দেওয়ালে। আলমারিও রয়েছে কয়েকটা।

দু হাতে ঠেলে জানলার দুটো শিক বেঁকাতে শুরু করলাম। বেশ মোটা শিক বেশ কষ্ট হ'তে লাগল। তারপর গলে যাবার মতন ফাঁক হ'তেই ঢুকে পড়লাম ঘরে। ভেতরটা ভাল ক'রে দেখে নিলাম আগে! দরজার কাছে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম সেটা বন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ। মনে হলো শেকল তোলা। সিন্দুকের কাছে গিয়ে পকেট থেকে বের করলাম একটি চাবি। গুড়ো রং মাখানো নিখোঁজ একটি চাবি। সেইটা চাড় দিয়ে আবার বের ক'রে আনতেই তার গায়ে দাগ পড়ল আসল চাবির খাঁজের। সেই দাগ দেখে টুকরো তার জুড়ে বানানো গেল একটা চাবি! তারপর সেটা দিয়ে একটু চেষ্টা করতেই খুট ক'রে ঘুরে গেল চাবিটা, আর তারপর হাতল ধ'রে টানতেই খুলে এল বাইরের ডালা। ভেতরের ডালাটা খুলতে তারপর পুরো এক মিনিটও লাগল না। তারপর সেই ডালাটা খুলে ফেলতেই টর্চের আলোয় প্রথমেই নজরে পড়ল ওপরের তাকে পুরোনো ভেলভেটের একটি বাক্স।

সিন্দুকের মধ্যে রেখেই খুলে ফেললাম বাক্সের ডালা। জমকালো একটি হার সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝক ক'রে উঠল টর্চের আলোয়। আর সেই মুহূর্তে দরজার কাছ থেকে একটা তীব্র টর্চের আলো পড়ল আমার ওপর এবং কানে ভেসে এল চাপা কণ্ঠস্বরের হুকুম – হাত তোলো!

গয়নার বাক্সটা খোলা রেখেই আস্তে আস্তে হাতটা তুলে ধরলাম মাথার ওপর। এবার শুধু বা-হাতটা নামাও। নামিয়ে টর্চটা বন্ধ ক'রে রাখো সিন্দুকের ওপর!

করা গেল তাই। কিন্তু লোকটা কে? হুকুম তো করছে, কিন্তু হুকুম করবার অধিকার কি আছে? মানে, হাতে পিস্তল রিভলভার কিছু আছে তো? না খামোখাই ভয় পাচ্ছি আমি! লোকটা এলই বা কোত্থেকে? এরকম তুখোড় ইংরেজিতে হুকুম করবার মতন কেউ তো থাকবার কথা নয় এখন এ-বাড়িতে।

—কে তুমি ? প্রশ্ন এল পেছন থেকে।

—চোর ! উত্তর দিয়ে জিগ্যেস করলাম—তুমি ?

—যে-বাড়িতে তুমি চুরি করতে ঢুকেছ তার মালিক !

—কথাটা সত্যি বললে না।

—কেন ?

—বাড়ির মালিক আইজাক মোজেস এখন ক্লাবে।

—সে খবরটা নিয়েই এসেছ দেখছি !

—তুমিও তো মনে হচ্ছে তাই !

—ভুল করছ। হঠাৎ একটা দরকারে ক্লাব থেকে ফিরে এসেছি আমি।

—তাই বুঝি ! আমি হেসে বললাম—তাহলে আর খামোখা রসিকতা করছ কেন ? নাও, আলোটা এবার তাহলে জ্বালো ঘরের, ডাকো বাড়ির চাকর-বেয়ারাদের ! তারপর পুলিশ ডেকে তাদের হাতে সঁপে দাও আমাকে !

—কী করব সেটা আমায় ঠিক করতে দাও। তার আগে সত্যি ক'রে বলো তুমি কে ?

—বললাম তো, চোর।

—সাধারণ চোর নও। তাদের মুখে তোমার মতন ইংরেজির খৈ ফোটে না।

—ঠিকই ধরেছ। সাধারণ চোর আমি নই। ঘটি-বাটি আমি চুরি করি না। আমার কারবার হীরে-জহরৎ নিয়ে। তোমারও পেশা মনে হ'চ্ছে তাই !

—হ্যাঁ।

—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশী হলাম। আমি বললাম —যাক, পরস্পরের পরিচয় ও উদ্দেশ্য তো জানা হয়ে গেল। অতঃপর কী কর্তব্য এখন আমাদের ?

— অবিলম্বে সড়ে পড়া এখান থেকে।

—তাহলে আর অপেক্ষা করছ কেন ?

—তোমার জন্যে। প্রথমে তুমি রওনা দেবে—যে-পথে এসেছো সেই পথে। তারপর আমি যাব।

—সেটা তো পরিষ্কার বুঝলাম। যেটা বুঝতে পারছি না সেটা হ'চ্ছে, ঐ নেকলেসটা কার সঙ্গে যাচ্ছে?

—কার সঙ্গে আবার! বলা বাহুল্য, গুলিভরা পিস্তল রয়েছে যার হাতে, তার সঙ্গে।

—সে তো একশোবার। আমি হেসে বললাম—মানে, পিস্তলটা যদি আদৌ থাকে!

—তার মানে?

- বলছিলাম, হাতের সেই পিস্তলটা একবার চোখে দেখতে পারি? মানে, যাতে বুঝতে পারি তোমার হুকুমটাই এখন আমার মেনে চলবার।

—ফিরে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। তবে সাবধান! হাত নামাবার চেষ্টা ক'রো না।

হাত ওপরে তুলেই ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে টর্চের আলোটা পড়ল একেবারে মুখের ওপর। আলোয় পিটপিট ক'রে বললাম - কৈ, দেখতে পাচ্ছি না তো!

—এই যে দেখো, ব'লে টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে তার বাঁ-হাতে ধরা পিস্তলটার ওপর ফেলল লোকটা। সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই বডি থ্রো ক'রে গিয়ে পড়লাম পিস্তল-ধারার পা-য়ে, আর পড়েই দু'হাত দিয়ে হেঁচকা টান দিলাম তার দু'টি পা ধ'রে।

গুলি চালাবার আর সুযোগ পেল না লোকটা। আমার হাতের টানে ঘুরে পড়ল সে। ছিটকে গেল টর্চ তার হাত থেকে। নিভেও গেল। উঠে আন্দাজে হাত চালালাম আমি। লাগলও বোধহয় তার মুখের কোথাও।

তারপর আমি আর কোন কায়দা করবার আগেই পিস্তলের বাঁট দিয়ে লোকটা জবরদস্ত একটা ঘা বসিয়ে দিল আমার মাথায়। সেই আঘাতে ঘুরে পড়ে গেলাম আমি।

আর পড়তে পড়তে অজ্ঞান।

জ্ঞান হবার বেশ কয়েক সেকেণ্ড পরে তবে বুঝতে পারলাম যে, তখনও চোখে যে অন্ধকার দেখেছি সে অন্ধকার চোখের নয়, ঘরের। তাড়াতাড়ি উঠে পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে জ্বেলে কাঠিটা তুলে ধরলাম, ধ'রে দেখলাম ঘর শূন্য। দরজাটা ভেজানো এবং হাঁ-ক'রে খোলা সিন্দুকের বাইরের ডালাটা। হাতের ঘড়িটা দেখলাম। মিনিট পাঁচেকের মতন বেহুঁশ হয়েছিলাম আমি। এর মধ্যে যদি বিপদের কোন আভাস পেয়ে ব্যবস্থা মতন আমায় সাবধান করার জন্যে গাড়ির হর্নের সঙ্কেত ক'রে থাকে এলা, তাহলে সেটাও নেহাতই মাঠে মারা গেছে।

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যেতে সেটা পকেটে পুরলাম। তারপর আরেকটা কাঠি জ্বালিয়ে উঠে গিয়ে টর্চটা নিলাম সিন্দুকের মাথা থেকে। দ্বিতীয় কাঠিটাও নিভিয়ে পকেটে পুরে তারপর টর্চ জ্বালিয়ে সিন্দুকের ভেতরটা দেখতে যেতেই খুটখুটে একটা পায়ের আওয়াজ পেলাম যেন পাশের ঘরে। ঘাড় ফিরিয়ে কান খাড়া করতেই তারপর ভেসে এল একটা সুইচ টেপার আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে ভেজানো দরজার তলায় ঝলক দিয়ে উঠল আলোর একটা রেখা! পায়ের আওয়াজটা যেন এই ঘরের দরজার দিকেই আসছে!

টর্চ নিভিয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে ঠিক ক'রে নিলাম, কী কর্তব্য! বেঁকানো শিকের মধ্যে দিয়ে গলতে অনেকটা সময় লাগবে। তার চেয়ে জানলার পর্দাটা টেনে সরিয়ে আর সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঐ আলমারির পেছনে লুকোনোটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে!

আর এক মুহূর্ত দেরি হ'লে বুঝি ধরা প'ড়ে যেতাম। আলমারির পেছনে গিয়ে আমি দাঁড়াবার একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরের দরজাটা দড়াম্ ক'রে খুলে গেল, আর খোলা দরজায় পাশের ঘরের আলো আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম এক নারীমূর্তি। সাধারণ নারী নয়, গাউন পরা!

দরজার কাছে কিছুক্ষণ প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল নারীমূর্তিটি। তারপর

হাত বাড়াল দেওয়ালের দিকে। সুইচের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আলো।

পাশাপাশি দাঁড় করানো দু'টি আলমারির মধ্যেকার ফাঁক দিয়ে নারীমূর্তির চেহারাটা দেখতে পেলাম এবার। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। তবে ধাঁচটা ইহুদী। মহিলা নিঃসন্দেহে কর্ত্রী, নয়তো পরিবারের আত্মীয়া কেউ।

আলো জ্বালিয়েও দাঁড়িয়ে রইলেন মহিলা। দেখতে লাগলেন ঘরের এদিক থেকে ওদিক। তারপর ধীরে জানলার দিকে এগিয়ে পরদা সরিয়ে দেখলেন, খোলা জানলা আর বেঁকানো শিক। দেখেই, তাড়াতাড়ি এসে টানলেন সিন্দুকের ডালার হাতল ধ'রে। ডালাটা খুলে যেতেই সেটা ঠেলে বন্ধ ক'রে দিয়ে দৌড়ে চ'লে গেলেন এ-ঘর থেকে। তারপর পায়ের আওয়াজে বোঝা গেল, পাশের ঘর থেকেও চলে গেলেন।

দেরি করলাম না আর। জানলার বেঁকানো শিকের মধ্যে দিয়ে গলে কার্নিশে এসে দাঁড়ালাম। তারপর কার্নিস ধ'রে প্রায় একরকম ছুটেই এলাম পাইপের কাছে। কার্নিসের ওপরের পাইপ ধ'রে নিচে ঝুলিয়ে দিলাম পা দুটো। তলাকার পাইপ যেন আর তারপর কিছুতেই ধরতে পারি না, ছুঁতে পারি না পা দিয়ে। তারপর যদি বা অনেক চেষ্টায় পারলাম তো পাইপটা পা দিয়ে ধ'রে এমন জোর পেলাম না যে, ওপরের পাইপ থেকে ভরসা ক'রে হাতটা ছাড়তে পারি।

এদিকে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছে। জানলা লক্ষ্য ক'রে গিয়েছেন মহিলা, বাড়ির লোকজন এখনি এসে হাজির হবে বাগানের দিকে।

না, আর দেরি নয়। যা হয় হবে, প্রথমে বাঁ হাতে কার্নিশের কোণা ধ'রে ওপরের পাইপ থেকে ছেড়ে দিই ডান হাত।

ছেড়ে দিয়েছি, ঝুলছি দু'হাতে ওই কার্নিস ধ'রে। পা দুটো আলগা হয়ে সরে এসেছে পাইপ থেকে, সেই ঝাঁকুনিতে।

পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে পাইপটার নাগাল পেতে যত দেরি হ'তে

লাগল, তত সঙ্গিন হয়ে আসতে লাগল হাতের অবস্থা। শেষে শূন্যে শরীরটা তুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পাইপটা ছুঁতে পারলাম, বারবার ছুঁতে লাগলাম বটে, কিন্তু ঠিক মতন জড়িয়ে ধরতে যেন আর পারি না। তারপর যখন দু'হাত অবশ হয়ে প্রায় আল্‌গা হয়ে এসেছে তখন মরিয়া একটা চেষ্টায় পাইপটাকে ফের জড়িয়ে ধরতে পারলাম পা দিয়ে, শক্ত ক'রে। কার্নিস ছেড়ে হাত দিয়ে পাইপটা আবার ধরতেও বেশ কষ্ট হলো। ধ'রেই পরমুহূর্তে পাইপ বেয়ে নেমে এলাম মাটিতে। আশ্চর্য, এখনও তো সাড়া শব্দ নেই কারুর! না, ওই তো গেটের দিক থেকে আসতে শোনা যাচ্ছে যেন কাদের। এলার গাড়ি ঠেলে দিয়ে চাকর-বেয়ারারা, না পুলিশ? যারাই হোক, তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, ছুটে তাড়াতাড়ি আমি দেওয়ালের কাছে এসে দাঁড়ালাম। পাট-করা চটটা তেমনি রয়েছে বসানো দেওয়ালের ওপর। ব'সে, দু'হাতে দেওয়াল ধরে পরপর তিনটে ঝট্‌কা দিয়ে দেওয়াল টপ্‌কে এসে একেবারে বাইরে পড়লাম। তারপর দেওয়াল থেকে চটের টুক্‌রোটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে সোজা দৌড় দিলাম মাঠের মধ্যে দিয়ে। কিছু দূর গিয়ে তারপর ঘুরে আন্দাজে গান্ধীঘাটের দিকে ছুটলাম। একনাগাড়ে বেশ কিছুটা ছুটে এসে তারপর থামলাম। দেখলাম, রাস্তার কাছে এসে পৌঁছেছি। এখন দৌড়লে নজরে পড়ব লোকের। হাঁটতে হাঁটতে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় উঠে এলাম। উঠে চলতে লাগলাম ধীরে সুস্থে।

ন'টার মধ্যে পৌঁছতে হবে আমাকে গান্ধীঘাটে। এলা গাড়ি নিয়ে তার মধ্যে চলে আসবে সেখানে। সওয়া ন'টা পর্যন্ত দেখবে। যদি তার মধ্যে আমি না ফিরে আসি তো আর অপেক্ষা না ক'রে একাই কলকাতা ফিরে যাবে এলা, এমন বলা রয়েছে এলাকে।

হাঁটতে হাঁটতে একবার ঘড়িটা দেখলাম হাতের। ন'টা বাজতে আর বিশেষ দেরি নেই দেখে গান্ধীঘাটের উদ্দেশ্যে এবার একটু দ্রুত করলাম পদক্ষেপ!

সেই ন'টা থেকে পাঁচ-পাঁচটা সিগারেট শেষ হ'য়ে গেল আমার, কিন্তু তবু এখনও পর্যন্ত এলার টিকিরও দেখা নেই। এলারও নয়,

আমার গাড়িরও নয়। দুর্ভাবনায় দগ্ধাতে দগ্ধাতে গান্ধীঘাটের ওই ছোট বাগানের মধ্যে বোধহয় মাইল তিনেক হেঁটে ফেলেছি আমি। এখনও হাঁটছি, আর ভাবছি এত দেরি হবার মতন কী হ'তে পারে এলার? এলারই কিছু হলো, না বিগড়ল গাড়িটা? কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। এমনিতে দেরি করবার মেয়ে সে নয়! কিন্তু কী হয়েছে? কী হ'তে পারে?

মোজেসদের বাড়িতে এতক্ষণ পুলিশ এসে গিয়েছে নিশ্চয়। আর পুলিশেরও আগে ক্লাব থেকে আইজাক মোজেস এবং তার স্ত্রী—অবশ্য ঐ মহিলা যদি তিনি না হন।

এলার খোঁজে ওই বাড়ির মধ্যে দূরে থাক—সামনেই যাওয়ার আর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কী হলো এলার? গাড়ি ব্রেক-ডাউন হ'লেও তো সে-খবর নিয়ে এতক্ষণ এসে পড়া উচিত ছিল তার। নাকি, ওই বাড়ির কাছাকাছি পেয়ে সন্দেহবশে তাকে আটক করল কেউ জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে? ষষ্ঠ সিগারেটটি ধরিয়ে আবার ঘাড় দেখলাম, দশটা বাজতে কুড়ি। নাঃ, এলার সন্ধান এবার একটা না করলেই নয়। একটু দূর থেকে লক্ষ্য ক'রে দেখবো নাকি বাড়ির গেটটা?

ভাবতে ভাবতে গান্ধীঘাট থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় ধ'রে এগোতেই একটা সাইকেল-রিক্সা এসে যেন থামল, আমার পথরোধ ক'রে। আর পরমুহূর্তেই তা থেকে নেমে এল শ্রীমতী এলা।

কী ব্যাপার? এত দেরি কেন? গাড়িটাই বা কোথায়? দেখেই প্রশ্ন ক'রে উঠলাম আমি।

—সর্বনাশ হয়েছে! একটা লোক পিস্তল দেখিয়ে গাড়িটা কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে আমার কাছ থেকে!

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ। কীভাবে বলছি, কিন্তু সেকথা কি এখানে দাঁড়িয়ে শুনবেন, না, বাগানের ভেতরে যাবেন?

—চল, ভেতরে চল।

রিক্সাওয়ালাকে ব'লে দাঁড় করিয়ে রেখে এলাকে নিয়ে আবার

ভিতরে ঢুকলাম। একটু নির্জন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম—বলো এবার!

—শুধু গাড়ি চুরিটাই বলব, না, গোড়া থেকে বলব সবকিছু? মানে, কী ঘটেছে আপনি যাবার পরে?

—গোড়া থেকেই বলো—ভেবে বললাম আমি। গাড়ি-চুরি ব্যাপারটা আলাদা ঘটনা, না, সম্পর্ক রয়েছে অন্য কোন ঘটনার সঙ্গে—সেটা তাহলে বুঝতে পারব।

—শুনুন তাহলে। আপনি যাবার পর গাড়ি থেকে নেমে তো বাড়ির গেটে গেলাম। যেমন বলে দিয়েছিলেন—দারোয়ানের কাছে খোঁজ নিলাম বাড়ির কর্তা-কর্ত্রীর। শুনলাম, বাড়িতে চাকর-বেয়ারা ছাড়া কেউ নেই। ফিরতেও সাহেব-মেমসাহেবের দেরি হবে, বলল দারোয়ান, কেননা ক্লাবে গিয়েছেন নাকি সাহেব-মেমসাহেব। শুনে আপনার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর গাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরটা বললাম দারোয়ানকে। সে এবং বাড়ির চাকর-বেয়ারা এসে একটু ঠেলে দিলেই স্টার্ট হবে যাবে, বললাম। সেই সঙ্গে বকশিসের কথাটাও। দারোয়ান তো তখনই বাড়ি থেকে তিন-চারজন লোক ডেকে নিয়ে এল এবং আমার সঙ্গে সকলে এল গাড়ির কাছে। তাদের দিয়ে গাড়িটা একবার ঠেলিয়ে নিয়ে গেলাম বাড়ির গেট পর্যন্ত। তারপর উল্টো ঠেললে সহজে স্টার্ট হ'তে পারে ব'লে আবার ঠেলিয়ে নিয়ে এলাম দূরে। এইভাবে বার দুয়েক করার পরই হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামল আমার গাড়ির পাশে। দেখলাম, সে গাড়ির পিছনের সীটে এক মহিলা ব'সে রয়েছেন। দেখে··

- কী রকম পোশাক মহিলার? বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলাম আমি—গাউন কি?

—হ্যাঁ। তার প্রতি বেয়ারা-দারোয়ান সকলের সভয় ও সসম্ভ্রম ব্যবহার দেখে আমি আন্দাজ করলাম যে, গাড়িটা মোজেসদের এবং মহিলাটি সম্ভবত মিসেস। নিঃসন্দেহ হবার জন্যে তখন মহিলাটিকে জিগ্যেস ক'রে বুঝলাম, আমার আন্দাজ ভুল নয়। বুঝে তো বাড়ির

মধ্যে আপনার সম্বন্ধে ভীষণ চিন্তা হ'তে লাগল আমার। কথাবর্তা ব'লে ওই রাস্তাতেই তখন যতক্ষণ পারি আটকে রাখবার চেষ্টা করলাম মহিলাকে, আর সেই সঙ্গে হঠাৎ হর্নটা আটকে গিয়ে এক নাগাড়ে বেজে যাওয়ার নির্দিষ্ট সঙ্কেতটা করলাম আপনাকে—যাতে আপনি সতর্ক হ'তে পারেন।

—সঙ্কেত করেছিলে তাহলে?

—কেন, শুনতে পাননি?

—না। সে কথা পরে বলছি। কী হলো তারপর, বলো মনে ক'রে, পরপর ঠিক ব'লে যাও!

দম নিয়ে এলা আবার বলতে শুরু করল- মহিলাকে মিসেল মোজেস ব'লে জানতে পেরে তাকে আটকাবার জন্য তখন আমি তাকে সবিনয়ে বললাম, তিনি যদি দয়া করে তাঁর ড্রাইভারকে একবার আমার গাড়ির গণ্ডগোলটা দেখতে বলেন, তাহলে আমি বড়ই উপকৃত হবো। মিসেস মোজেস কিন্তু দাঁড়ালেন না, বাড়িতে পৌঁছেই তাঁর ড্রাইভারকে আমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন ব'লে চলে গেলেন। যাবার সময় দু'জন বেয়ারাকেও তুলে নিয়ে গেলেন ড্রাইভারের পাশে। দেখে তো আপনার সম্বন্ধে আরো ভীষণ ভাবনা হলো আমার। দারোয়ানের সঙ্গে একটু কায়দা ক'রে কথা বলে জানতে পারলাম যে ক্লাব থেকে একা এবং এই রকম অসময়ে ফিরে আসা মিসেস মোজেসের এই প্রথম। শুনে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, এ-যাত্রা কপাল আমাদের নেহাত-ই মন্দ। তাই আর অপেক্ষা না ক'রে, এদিকে ঘড়িতে ন-টাও বেজে এসেছে দেখে তখন ইঞ্জিনের তেল যাবার পাইপের সুইচটা খুলে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট ক'রে চলে এলাম ওখান থেকে। তারপর বড় রাস্তার দিকে আসছি, হঠাৎ একটি লোক রাস্তার ঠিক পাশের অন্ধকার থেকে দৌড়ে একেবারে আমার গাড়ির সামনে এসে পড়ল। আমি—

—আর লোকটাকে বাঁচাতে গিয়ে ধাক্কা মারলে গাছে নয়তো গাড়ি নিয়ে গিয়ে ফেললে পাশের নালায়!

—কোনটাই নয়। আমি ব্রেক কষে গাড়ি থামাতেই সে লোকটা

সামনে থেকে চট ক'রে ঘুরে গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসল আমার পাশে। আমি আপত্তি করতেই পকেট থেকে একটা পিস্তল বের ক'রে ধরল। আর তার নির্দেশ মতন গাড়ি চালাতে হুকুম করল আমায়। ওই ভাবে চালিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়তে তখন চালাতে বলল কলকাতার দিকে। তারপর সেদিকে মাইল দুয়েক যাবার পর ফাঁকা মাঠ দেখেই বোধহয় হঠাৎ থামাতে বলল গাড়ি। গাড়ি থামাতেই তখন পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচা মেরে নেমে যেতে বলল আমায় গাড়ি থেকে। আমি ইতস্তত করতে পিস্তলটা একেবারে আমার কানের পাশে চেপে বলল—সাইলেন্সার লাগানো রয়েছে পিস্তলে। জায়গাটাও ফাঁকা। যদি মরতে না চাও তো যা বলছি শোন! অগত্যা, গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম আমি। নামবার পর আবার হুকুম করল, বাঁ দিকের মাঠের মধ্যে হেঁটে ঢুকে যেতে। গজ পঁচিশেক ওই ভাবে যাবার পর আওয়াজ পেলাম গাড়ি আবার রওনা হবার। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, গাড়িটা চলে গেল কলকাতার দিকে। তখন বড় রাস্তায় ফিরে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তবে ওই সাইকেলরিক্সা ধরলাম। তারপর রিক্সাওয়ালাকে তাড়া দিয়ে এখানে এসে পৌঁছোতে আমার যা দেরি।

—হুঁ। সব শুনে আমি প্রথমে জিগ্যেস করলাম—হাতে বা কাছে কোন টর্চ দেখলে লোকটার?

—না। তবে প্যান্টের একটা পকেট যেভাবে উঁচু হয়েছিল তাতে ভেতরের জিনিসটা টর্চ হওয়া সম্ভব।

—পরণে কী ছিল?

—শার্ট ও প্যান্ট। কোমরের ওপরের শার্টের বাঁ দিকটা একটু ফোলা। বোধহয় কিছু রাখা ছিল ভেতরে।

—চেহারা?

—চেহারাটাই ভাল ক'রে দেখতে পাইনি। ডান হাত দিয়ে বাঁ-চোখের ওপর একটা রুমাল ধরে রেখেছিল। একবার রুমালটা একটু সরে যেতে যেন মনে হলো, আঘাত লেগেছে চোখে।

—পিস্তলটা কোন্ হাতে ধরেছিল? ডান হাতে রুমাল যখন, তখন নিশ্চয়ই বাঁ হাতে?

—হ্যাঁ।

—তার মানে ন্যাটা!

—নাও হ'তে পারে। এলা প্রতিবাদ করে উঠল—ন্যাটা কী ক'রে অনুমান করছেন? ডান হাতে রুমাল ধরেছিল বলেই হয়তো বাঁ হাতে ধরেছিল পিস্তলটা।

—উহুঁ। চোখে রুমাল ধরবার জন্য বাঁ-হাতই ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ। আর বাঁ চোখ হলে তো করবেই। তার মানে, ন্যাটা নিশ্চয়ই লোকটা! আমি বুঝিয়ে বললাম।

— বেন মোজেসের মতন? ফস্ করে প্রশ্ন করে উঠল এলা।

—হ্যাঁ! আমি সায় দিয়ে বললাম, আর তারপর জিগ্যেস করলাম—একটু ভাল ক'রে মনে করে দেখো তো বেন মোজেসই কিনা?

—বেন মোজেস? হ্যাঁ, তা হ'তে পারে। মানে, হ'তেও পারে—ঠিক বলতে পারছি না! এলা ভাবতে ভাবতে বলল—গোঁফও রয়েছে। ঐরকম লম্বা। তবে একটু যেন রোগা—

- রোগা! নাকি শুধু শার্ট পরা ছিল বলে তুলনায় রোগা মনে হয়েছে তোমার চোখে!

—তাই কি! এলা সংশয়ের সুরে বলল—কিন্তু গলা! গলাটা একেবারে আলাদা।

—তোমার কাছে ইচ্ছে ক'রে বদলে থাকতে পারে। তবে, গলা চেপে বিকৃত ক'রে বলে থাকতে পারে কথা।

—তাহলে অবশ্য বলতে পারছি না!

— যাহোক বাঁ চোখের আঘাতটা বেশ ভালই লেগেছে, দেখলে?

— মনে তো হলো। কেন?

— এই হতাশ ব্যাপারের মধ্যে ওইটুকুই যা এখন আমাদের সান্ত্বনা। ঘুষিটা আমার ফসকায়নি।

—তার মানে?

মোজেসদের বাড়িতে আমার দিকের ঘটনা এবার সংক্ষেপে বললাম এলাকে। শুনে তো এলার আর কোন সন্দেহই রইল না। দাঁতে দাঁত চেপে ব'লে উঠল—না, তাহলে আর কোন ভুল নেই। ঐ শয়তানটা নিশ্চয়ই বেন মোজেস।

—আমারও তো তাই মনে হচ্ছে। তবে—

—কাল সকালে শয়তানটা অফিসে এলেই বোঝা যাবে—ওর বাঁ-চোখের অবস্থা দেখে চোখে গগল্‌স্‌ দিয়ে নিশ্চয়ই আসবে আবার। তবে না খুলিয়ে আমি ছাড়ব না, সেটা আগে থেকে বলে রাখছি আপনাকে!

- সে-সুযোগ আর তোমার হবে বলে মনে হয় না, এলা।

· কেন?

—যদি সত্যি বেন মোজেসই হয় লোকটা—আমি বুঝিয়ে বললাম এলাকে—তাহলে কাল অফিসে আসবার আর কোন কারণ নেই তার। যে হারের জন্য আসবে মানে, আসার কথা—সে-হার তো এখন তার হাতেই!

এলাকে ছেড়ে তারপর আমি নিজে ভাবতে শুরু করলাম। পরিস্থিতিটা দ্রুত বুঝে নিয়ে কিংকর্তব্য স্থির করতে দ্রুতই বিচার ক'রে দেখতে লাগলাম ঘটনাগুলির তাৎপর্য।

গাড়ি-চুরির খবরটা বোধহয় এখানকার পুলিশকে জানানো উচিত। না, গাড়িটার জন্য নয়। যে নিয়ে গেছে—সে বেন মোজেস হোক বা অন্য কেউ—চুরির উদ্দেশ্যে গাড়িটা সে কখনোই নিয়ে যায়নি। নিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি অকুস্থল থেকে সরে পড়বার জন্যেই। কলকাতা পৌঁছে নিশ্চয়ই ময়দান বা লেক বা অন্য কোথাও গাড়িটা ফেলে রেখে চলে যাবে।

গাড়িটা উদ্ধারের জন্য কলকাতায় ফিরেও গাড়ি-চুরির খবরটা জানাতে পারি আমি পুলিশকে—আমার অফিস, ফ্ল্যাট বা কোন সিনেমা হাউসের সামনে থেকে চুরি গিয়েছে বলে। আর তাতে মোজে-

সের বাড়ির হার চুরির হাঙ্গামাও আর পোহাতে হয় না আমাদের—মানে, আমাকে বা এলাকে।

'কিন্তু আমার গাড়ি যদি হঠাৎ কোন অ্যাক্সিডেন্ট ক'রে বসে এখন, পালাবার তাড়াহুড়োয় হার-চোর চাপা দিয়ে বসে কারুকে—তাহলে? আর তারপরও যদি—অ্যাক্সিডেন্ট কিছু করে বা না করে—হার-চুরির কোনও সূত্র ফেলে যায় গাড়িতে? তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই হাঙ্গামাতেই গিয়ে ফের জড়াতে হবে আমাকে, আর তখন বেশ গভীর ভাবেই।

আমি তো পাইপ বেয়ে ঢুকেছিলাম ঐ ঘরে। কিন্তু ঐ লোকটা? সে যে সেভাবে ঢোকেনি তাতে তো কোন ভুল নেই। ঢুকলে জানলা খোলা থাকতো, শিকও বেঁকানো থাকতো! কিন্তু তা ছিল না। তার মানে বাড়িতে ঢুকেছিল সে অন্য কোন ভাবে—অন্য কোন পথে। হয়তো বাথরুমের ঐ সিঁড়ি দিয়েই। হয়তো কেন নিশ্চয়ই তাই।

তাকে আক্রমণ করার সময় তার পিস্তল না-ছোঁড়ার কারণটা আমি ভেবেছিলাম—আওয়াজের ভয়। কিন্তু তা তো নয়। সাইলেন্সার যদি লাগানো ছিল তার পিস্তলে, তবে ছুঁড়ল না কেন সে?

না-ছোঁড়ার কারণ বোধহয় আমাকে ঐ ঘরে দেখেই সে ঠিক করেছিল যে, আমাকে চলে আসতে দেবে। দিতও, যদি আমি হাঙ্গামা বাঁধাবার চেষ্টা না করতাম। আসবার সময় জানলার শিকটা শুধু ঠিক ক'রে আসতে দিত না। অর্থাৎ, হারটা বাইরে থেকে ওই পাইপ-পথে এসে কেউ চুরি করেছে ব'লে যাতে মনে করতে পারে সবাই। মতলব নিশ্চয়ই তাই ছিল লোকটার। তারপর আমি হাঙ্গামা করবার চেষ্টা করতে আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়েই অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল আমাকে!

—কিন্তু লোকটা কে? সত্যিই কি বেন মোজেস?

যদি সত্যিই বেন মোজেস হয়, তাহলে আমাকে পাঠিয়ে আবার সে নিজে যেতে আসতে যাবে কেন? কী কারণ থাকতে পারে নিজে যাবার? যাক্, সে কারণ যাই হোক, হার তো এখন তার হস্তগত

হয়েছে। এখন হার যে তার হকের জিনিস সেটা প্রমাণ করুক সে। প্রমাণ করুক যে, চুরি করে নিলেও হকের জিনিসই নিচ্ছে সে, বঞ্চিত করছে না সে আইজাক মোজেসকে। হ্যাঁ, সেটা প্রমাণ করুক আইনত। আর, সেই জন্য বামালসুদ্ধু ধরা পরা দরকার তার পুলিশের হাতে। আর যদি বেন মোজেস না হয়ে আর কেউ হয়, তাহলে তো আরও বেশি দরকার তার বামালসুদ্ধু পুলিশের হাতে ধরা পড়বার! আর ধরা পড়লেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে আমার। আমার মানে আমার মক্কেল বেন মোজেসের। রত্নহারের অস্তিত্ব আর তখন অস্বীকার করতে পারবে না আইজাক মোজেস। সুড়সুড় করে হারটি তখন তুলে দিতে হবে বেন মোজেসকে—মানে সত্যিই যদি রত্নহারটি বেন মোজেসের মায়ের সম্পত্তি হয়!

হাতে দস্তানা ছিল না হার-চোরের। সিন্দুকের গা বাঁচালেও খুবই সম্ভাবনা আমার গাড়িতে আঙুলের ছাপ এবং অন্যান্য সূত্র রেখে যাওয়ার।

সে-সব সূত্র হাতে পাওয়া দরকার পুলিশের। আর এখান থেকে গাড়িচুরি গেছে বলে জানলেই তবে সঠিক সূত্র পুলিশ পাবে। জানলে মানে এখন জানালে সেইসঙ্গে জড়িয়ে পড়ব অবশ্য আমি ও এলা। কিন্তু একটু জড়িয়ে না পড়লেও তো এক্ষেত্রে দেখছি চলছে না। পুলিশ তো ভাঙা জানলা ও বেঁকানো শিক এর সূত্র ধরে সন্ধান করবে চোরের। ঐ সূত্রগুলি চোরের ধাপ্পা সেটা বোঝানো দরকার পুলিশকে। আর কে ঠিক মতন সেটা বোঝাতে পারবে পুলিশকে, আমি ছাড়া? গায়ে পড়ে সেটা বোঝাতে গেলে উল্টো বুঝবে পুলিশ। তবে হাঙ্গামায় যদি একটু জড়িয়ে পড়ি। বেশি নয়, একটু—তাহলেই পুলিশকে ঠিক মতন বোঝাতে পারব। ঠিক পথে চালাতে পারব তাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরগুলি কায়দা ক'রে দিয়ে। অতএব—

আমাকে চুপচাপ ভাবতে ও পায়চারি করতে দেখে ইতিমধ্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল এলা। আমি মুখ তুলে তাকাতেই আশান্বিত মুখে তাকাল সে আমার দিকে।

—চলো। বললাম আমি এলাকে—এই সাইকেল-রিক্সা ক'রেই চলো। মোড় থেকে আরেকটা সাইকেল-রিক্সা নিয়ে যেতে হবে তোমায় ব্যারাকপুর থানায়।

—থানায়! অবাক হয়ে গেল এলা।

—হ্যাঁ। সেখানে গিয়ে গাড়ি-চুরির ব্যাপারটা বলতে হবে তোমার। একরকম হুবহু। শুধু তোমার সঙ্গে আজ আমি ব্যারাকপুরে এসেছিলাম, এই খবরটুকু বাদ দিয়ে। বলতে হবে তোমার মনিব কুশল চৌধুরীর গাড়ি নিয়ে গান্ধীঘাটে একা বেড়াতে এসেছিলে তুমি। ফেরবার সময় রাস্তা ভুল ক'রে মোজেসের বাড়ির রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। তারপর গাড়ি হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। আর তারপর থেকে আবার হুবহু যা ঘটেছিল তাই বলে যাবে। শুধু গাড়ি খোয়ানোর পর সাইকেল-রিকসা ক'রে এখানে আসবার কথা বলবে না। বলবে, অনেক গাড়িকে হাত দেখানোর পর শেষে এক ভদ্রলোক গাড়ি থামিয়ে তুলে নিয়েছেন তোমায়। তোমার কাছে সব শুনে পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে থানা অবধি আর আসেন নি, নামিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তোমায় মোড়ে। সেখান থেকে একটা সাইকেল-রিকসা নিয়ে সোজা উপস্থিত হয়েছ থানায়। কেমন মনে থাকবে তো?

—থাকবে। গলার সুরটা বেশ অপ্রসন্ন এলার।

—মোজেসের বাড়ির চুরির খবর নিশ্চয়ই পৌঁচেছে এতোক্ষণে থানায়। সেজন্য বেশ একটু ঝামেলা হবে তোমার। কিন্তু এ-অবস্থায়, সেটা এড়াবার কোন উপায় নেই। ব'লে এলার সঙ্গে রিক্সার দিকে এগিয়ে গেলাম।

—তারপর মনিব হিসেবে আপনার নাম বলবার পর সে ঝামেলা যে চরমে উঠবে, তাও খুব ভাল বুঝতে পারছি। যেতে যেতে বলল এলা ঠাণ্ডা গলায়।

তা বাড়বে! কিন্তু ওই যে বললাম - উপায় নেই! ব'লে এলার পিঠে হাত রাখলাম আমি—ব্যাপারটা যে বেশ একটু ঘোরাল হ'য়ে উঠেছে, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

—আপনি কেস'টা নেবার সময় আমার মন কেন সাড়া দিচ্ছিল না, সেটাও এবার বেশ বুঝতে পারছি, ফোঁস করে ব'লে উঠল এলা। আমাকে একটু নরম বুঝতে পেরে, বেন মোজেস লোকটা যে একটা কোন ফাঁদে ফেলতে এসেছে, তখুনি কেমন বুঝতে পেরেছিলাম আমি।

—সত্যিই তাই কিনা সেটা তো কাল বেন মোজেস অফিসে আসা বা না আসা পর্যন্ত তো সঠিক জানা যাচ্ছে না!

—এখনো সন্দেহ রয়েছে আপনার?

—হ্যাঁ।

—আমাকে জেলে পুরে তবে যদি সন্দেহের শেষ হয় আপনার। উত্তর করল এলা ঠোঁট ফুলিয়ে।

এলাকে বড় রাস্তার একটু আগে নামিয়ে ব'লে দিলাম, থানায় পৌঁছেই সেখান থেকে আমার ফ্ল্যাটে ফোন করবার কথা। তারপর ওই সাইকেল-রিক্সা নিয়েই আমি তাড়াতাড়ি গেলাম আবার আরেক ডাক্তারখানায়। ফোন করলাম সেখান থেকে আমার ফ্ল্যাটে। ভৃত্য আবতুলকে ব'লে দিলাম সশরীরে এসে বা ফোনে আমার খোঁজ কেউ করলে, সে যেন বলে যে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ফিরে এসে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ফ্ল্যাটেই ছিলাম আমি। তারপর কে একজন গাড়ি পাঠাতে সেজেগুজে বেরিয়েছি সেই গাড়িতে। যাবার সময় বলে গিয়েছি রাতে খাব না।

ফোন সেরে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এসে সাইকেল-রিক্সা-ওয়ালার কাছে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বের করে ধরলাম তার সামনে। বললাম, ঐ মেমসাহেব বা আমাকে আজ সওয়ারী তুলেছিলে, ঐ ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে যেতে হবে তোমাকে। পারবে?

কী বলতে চাইছি, সেটা বুঝে উঠতে এক সেকেণ্ডও লাগল না সাইকেল-রিক্সাওয়ালার। হাত বাড়িয়ে মুহূর্তে নিয়ে নিল সে নোট তিনটে। একটা ট্যাক্সি ধ'রে তারপর আমি রওনা দিলাম কলকাতা।

পথে দু'বার ট্যাক্‌সি বদলে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে এসে ফ্ল্যাটে পা দিতে না দিতেই আবদুলের কাছে শুনলাম যে, কিছুক্ষণ আগে নাকি আমার ফোন এসেছিল ব্যারাকপুর থানা থেকে। যত রাতই হোক আমি যেন ফিরেই ওই থানায় ফোন করি- এ-কথা বারবার ক'রে নাকি বলে দিয়েছে থানা থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। ক'রে বললাম—আমি কুশল চৌধুরী বলছি। এইমাত্র বাড়ি ফিরে এসে শুনছি, আপনারা নাকি আমাকে ফোন করতে বলেছেন। তা, কী ব্যাপার—কোন অ্যাক্‌সিডেন্ট নাকি?

- ধরুন! উত্তর এল। তারপর একটু ধ'রে থাকার পর গলা বদল হয়ে একজন বলল—আপনি কুশল চৌধুরী? নমস্কার। আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম। আমি এখানকার থানা অফিসার, ভৌমিক।

—নমস্কার। বলুন, কী ব্যাপার!

—কী ব্যাপার, কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

—কোন অ্যাক্‌সিডেন্ট কি?

— কেন, অ্যাক্‌সিডেন্ট মনে করছেন কেন?

— আমার সেক্রেটারি এলা মাথুর আজ আমার গাড়ি নিয়ে গান্ধী-ঘাটে গিয়েছে। এখনো ফেরেনি, তাই। গাড়িও নতুন চালাচ্ছে সে। ভাবছি, আমার আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত সত্যি হল নাকি?

—না। ঘটনা তার চেয়েও মারাত্মক।

—কী রকম? জখম হয়েছে নাকি এলা কিম্বা জখম করেছে কারুকে চাপা দিয়ে?

-- না, খুন জখম কেউ হয়নি। গাড়িটা চুরি গিয়েছে আপনার!

– অ্যাঁ! বিস্ময়ের ভাবটা কতখানি ফুটল গলায়, কে জানে।

—শুধু তাই নয়। আমরা অনুমান করছি, এ অঞ্চলে একটি বাড়িতে চুরি করে একটি চোর ওই গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।

– অ্যাঁ! গলাটাকে যতখানি সশঙ্কিত করা সম্ভব, করলাম। উদ্বিগ্ন

কণ্ঠে বললাম—কী ভয়ানক কথা। তা, এলা, মানে আমার সেক্রেটারিটি কোথায়?

—রয়েছেন এখানে। কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাকে দিন। ব্যস্ত হয়ে বললাম আমি।

তারপর এলা এসে ফোন ধরল। ধ'রে কী চমৎকার যে অভিনয় করল এলা, কী বলব! ভীত সন্ত্রস্ত আর সেই সঙ্গে ভীষণ উত্তেজিত ভাবে সমস্ত ঘটনাটা জানালো আমাকে। এ কথাও জানালো যে, যে-বাড়িতে লোক ডাকতে গিয়েছিল গাড়ি ঠেলবার জন্য-চুরিটা সেই বাড়িতেই হয়েছে। সবটাই অবশ্য পুলিশকে শোনাবার জন্য।

এলার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ ধরে উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত-ভাবে কথা বললাম আমি থানা অফিসারের সঙ্গে। তারপর এলার কলকাতা ফেরার জন্য তারা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছে শোনবার পর যখন শেষমেষ রিসিভার নামিয়ে রাখলাম, তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে বারোটা।

সকালে ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের বাজনায়। একটা চোখ আধ-খানা খুলে হাত ঘড়িতে সময় দেখলাম। আটটা বাজে দেখে তাড়া-তাড়ি উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে সাড়া দিলাম—কুশল চৌধুরী স্পিকিং!

সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল এলার—আমি এলা কথা বলছি, মিঃ চৌধুরী। গোয়েন্দা-পুলিশ থেকে আবার লোক এসেছে আমার হস্টেল-এ। আমাকে যেতে বলছে, ওদের সঙ্গে। আমি পোশাক বদলাবার নাম ক'রে ওপরে এসে মেট্রন-এর ঘর থেকে ফোন করছি!

—কতক্ষণ এসেছে, পুলিশ?

—মিনিট পনেরো।

—শাদা পোশাকে?

—হ্যাঁ, আর হাঁদা চেহারার।

পুলিশ যত হাঁদা চেহারার দেখবে, জানবে তত বেশি বাস্তু ঘুঘু। যাও আর দেরি করো না।

- যেতে বলছেন, ওদের সঙ্গে? একটু যেন হতাশার ভাব ফুটে উঠল এলার গলায়।

– হ্যাঁ, ভালোয় ভালোয় যেতে বলছি।

তার মানে?

– মানে, মানে-মানেই যাওয়া ভালো, ধরে-বেঁধে নিয়ে যাবার আগে।

—বেশ, তবে তাই যাচ্ছি। রাখছি তাহলে ফোন, গলাটা কঠিন শোনাল এবার এলার।

হ্যাঁ! আর ভুলো না, পোশাক বদলাবার নাম ক'রে ওপরে এসেছ! নিচে নামবার আগে প্রয়োজন না থাকলেও বদলে যেও পোশাকটা।

– আর কিছু বলবেন? অভিমানের বেষ একটু বুঝি রোষও এলাব গলায়।

– না, আর কিছু নয়। মানে, বলার আর যা আছে, তোমায় বলা তা বাহুল্য। পুলিশেব প্রশ্নেব বুঝে শুনে উত্তর দেবাব মতন যথেষ্ট বুদ্ধি তোমার আছে।

—ভরসা দেবার চেষ্টা কবছেন?

– তোমাকে ভরসা দেব আমি? পুলিশ তো পুলিশ, ইচ্ছে করলে আমাকেও এক হাটে বেচে অন্য হাটে কিনতে পার তুমি! ব্যারাক-পুর থানা থেকে কালকের ফোনে সেটা শুধু নতুন কবে বুঝিনি আমি - সেইসঙ্গে তোমার ওপর ভরসা আমার অনেক, অনেক বেড়ে গেছে।

শুনে অভিমানের ভাবটা এবার চলে গেল এলার গলা থেকে। বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

—আর, হ্যাঁ শোনো! পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই সোজা তোমার হটেলেএ ফিরে আসবে। ফিরে অপেক্ষা করবে আমার টেলিফোনের জন্যে। দুটো নাগাদ টেলিফোন করব'খন আমি।

—যদি দুটোর মধ্যে না ফিরতে পারি ? এলা প্রশ্ন করল—মানে, ছাড়া না-পাই তার মধ্যে ?

—দুটোর পর থেকে একঘণ্টা অন্তর হপ্টেল-এ তোমায় ফোন করে যাব আমি।

—আর যদি একেবারেই না ছাড়ে ?

—হ্যাঁ, সে-সম্ভাবনা একেবারে যে নেই, তা নয়।

—তাহলে ?

—তোমায় না ছাড়লে আমাকেও ছেড়ে কথা কইবে না গোয়েন্দা পুলিশ, একথা জেনে রাখো। ওদের আস্তাতেই দেখা হবে তাহলে তোমার সঙ্গে আমার। নাও, এবার ফোন ছাড়ছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চিন্তিতমনে মুখ ফেরাতেই দেখলাম, আমার গলার আওয়াজে তৎপর হয়েছে আবদুল। ট্রে-তে ক'রে চা ও খবরের কাগজ নিয়ে কখন নিঃশব্দে এসে খাটের অন্য পাশে দাঁড়িয়েছে।

ভাবতে ভাবতে চা-য়ে একটা চুমুক দিয়ে খবরের কাগজটা তুলে অভ্যাসমতন মেলে ধরলাম চোখের সামনে।

আর, রোজকার অভ্যাসমতনই প্রথমে খবরের হেড লাইন-গুলির ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। তারপর প্রথম পাতার নিচের দিকে দু'কলাম ব্যাপী সচিত্র একটি খবরের হেডলাইনে গিয়ে একেবারে আটকে গেল চোখ –

ব্যারাকপুরে দুঃসাহসিক চুরি

ধনীর গৃহ হইতে মূল্যবান অলঙ্কার অপহৃত :
জনৈক বে-সরকারী গোয়েন্দার গাড়িতে
চোরের অকুস্থল হইতে পলায়ন !

হেডলাইনগুলির নিচে তারপর বিস্তারিত খবর। খবরটার ডানদিকের কলামে একটা ছবিও রয়েছে অপহৃত ধনী ব্যক্তিটির। অর্থাৎ,

আইজাক মোজেসের। বেন মোজেসের সঙ্গে মিল আছে চেহারার—তবে টাক মাথা!

আদ্যোপান্ত তাড়াতাড়ি প'ড়ে ফেললাম খবরটা।

না, ঐ চম্পট পর্যন্তই—আমার নামের উল্লেখ নেই বিস্তারিত সংবাদের কোথাও! আমারও নয়, এলারও না। একমাত্র বে-সরকারী গোয়েন্দার সেক্রেটারি মহিলা, না পুরুষ—সে-সম্বন্ধেও ব্যাখ্যা ক'রে বলা নেই কোথাও কিছু—খবরের মধ্যে।

মোটামুটি খবরটুকু এই ঃ

কাল শনিবার, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে ব্যারাকপুর পাম-গ্রোভ এর বাসিন্দা ইহুদি ব্যবসায়ী মিঃ আইজাক মোজেস সস্ত্রীক ব্যারাকপুর ক্লাবে যান। খাওয়া-দাওয়া করার কথা ছিল তাঁদের ক্লাবেই। কিন্তু হঠাৎ মাথা ধরার জন্য মিসেস মোজেস পৌনে ন'টায় বাড়ি ফিরে আসেন।

বাড়ি ফিরে এসেই মিসেস মোজেস তাঁদের শোবার ঘরের সংলগ্ন একটি ঘরে ওষুধ আনতে যান। কিন্তু সে-ঘরে ঢুকেই তিনি দেখতে পান যে একটি জানলা খোলা ও তার কাঁচ ভাঙা এবং সেই সঙ্গে জানলার শিকও বেঁকানো।

দেখে মিসেস মোজেসের রীতিমত সন্দেহ হয় আর তাই তখন সেই ঘরে রাখা সিন্দুকটি পরীক্ষা ক'রে দেখেন। সিন্দুকের ডালা খোলা এবং তার মধ্যে রাখা তাঁর মৃতা শাশুড়ির বহুমূল্য রত্নহারটি নেই দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্লাবে ফোন ক'রে মিঃ মোজেসকে ঘটনাটা জানান।

খবরটা শুনে মিঃ মোজেস তখনই ঐ ক্লাব থেকেই পুলিশকে ফোন করেন। তারপর তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। পুলিশও অবিলম্বে সেখানে গিয়ে পৌঁছোয়। তারপর যখন পাম-গ্রোভে গিয়ে পুলিশ তদন্তে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আরেকটি ঘটনা ঘটে।

কলকাতার একজন কর্মিষ্ঠ বে-সরকারী গোয়েন্দার সেক্রেটারি ব্যারাকপুর থানায় উপস্থিত হয়ে সেই সময় অভিযোগ জানায় যে জনৈক দুর্বৃত্ত পিস্তল দেখিয়ে তার কাছ থেকে তার মনিবের গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

সেক্রেটারিটি থানায় আরো জানায় যে, তার মনিবের গাড়ি নিয়ে সে নিজেই চালিয়ে গান্ধীঘাটে বেড়াতে এসেছিল। ফেরার সময় মিঃ মোজেসের বাড়ির কাছাকাছি তার গাড়ি আটকে যাওয়ায় সাহায্যের জন্য সে সামনে মিঃ মোজেসের বাড়ির গেটের দরোয়ানের কাছে গিয়েছিল। বাড়িটা কার অবশ্য তখন তার জানা ছিল না।

বাড়ির মালিকেরা অনুপস্থিত থাকলেও সেজন্যে সেক্রেটারিটির বিশেষ অসুবিধা হয় নি, চাকর-দারোয়ানেরা তার কথা শুনে তখনই গাড়ি ঠেলে দিতে এসেছিল। তারপর গাড়ি চালু হ'তে যখন সেক্রেটারিটি সেটি চালিয়ে চ'লে আসছিল তখনই নাকি পথে দুর্বৃত্তটি হাত দেখিয়ে তার গাড়ি থামায় এবং পিস্তল দেখিয়ে গাড়ি থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয়।

এই চুরি ও রাহাজানি দু'টি ভিন্ন ঘটনা একই অকুস্থলে সময়ের অল্প ব্যবধানে সঙ্ঘটিত হওয়ায় স্বভাবতই পুলিশ অনুমান করছে যে, একজনই দুর্বৃত্ত প্রথমে মিঃ মোজেসের বাড়ি থেকে বহুমূল্য রত্নহারটি অপহরণ করেছে এবং তারপর পালাবার সময় বে-সরকারী গোয়েন্দার ঐ গাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে পলায়ন করেছে।

খবরটা পড়ে কাগজটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল আবার। তারপর রিসিভার তুলে সাড়া দিতে না দিতেই গুরুগম্ভীর গলার ধমক কানে এল একটা—আমি বাগচি!

—কী বলছেন, ভাগচি? আমি বিরক্ত হয়ে ফোনে বললাম—তা ভাগবার মতন কাজ করে থাকলে ভাগবেন বৈ কি! কিন্তু সে খবর আমায় দেবার দরকার কী? তাছাড়া, আপনি কে সেটাও তো আমি গলা শুনে বুঝতে পারছি না।

উত্তরে বেশ একটা বিরক্তি কানে ভেসে এলো। আঃ, আমি বাগচি বলছি!

—কী বললেন, রাগচি? আমি আরো বেশি বিরক্ত হয়ে জবাব

দিলাম—রাগছেন তো কী হয়েছে? বাংলার লাট নাকি যে সবাইকে ফোন করে সেটা জানাতে হবে?

—আমি ডেপুটি কমিশনার বাগচি! আবার একটা ধমক এবার—তোমার ওসব চালাকি রাখো?

—আরে, ছি ছি! ভীষণ একটা লজ্জা পাওয়ার ভান করলাম আমি এবার—মিঃ বাগচি, তাই বলুন! শরীর কেমন?

—ভালো। এখন বলো—

—সে কী? বাগচির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম ফোন করলেন আপনি আর আমি বলবো—সে কখনো হয়!

—ও-সব ছেঁদো কথা রাখো! কাল রাতে ব্যাবাকপুরে মোজেসের বাড়ির চুরিতে তুমি জড়িত কিনা, বলো!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—স্বীকার করছ তাহলে?

না ক'রে উপায় কি? আমার গাড়িখানা তো সেই চোরই নিয়ে গেছে ব'লে শুনছি। মানে, আজকের কাগজে বেরুনো আপনাদের পুলিশের অনুমান যদি সত্যি হয়!

—গাড়ি খোয়া যাওয়ার ব্যাপার নয়। চুরির ব্যাপারে তুমি জড়িত কিনা তাই বলো!

—আজ্ঞে, ভয়ে বলবো, না, নির্ভয়ে?

—তার মানে?

—সত্যি কথা বললে আবার রুলের গুঁতো মারবেন কি না, সেটা জিগ্যেস করছি।

—ইয়ার্কি রেখে কি বলতে চাও, বলো—

—এই চুরির ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই জড়িত—কেননা আমার গাড়িখানা খোয়া গেছে। কিন্তু তার জন্য কোথায় আমি গিয়ে তম্বি করব পুলিশের ওপর, না, উল্টে আপনারাই তেড়ে এসে ধমকাতে শুরু করেছেন আমাকে!

—বটে, বটে!

—বটেই তো!

—তবে শুনে রাখো। আমাদের দপ্তরের সকলের দৃঢ় ধারণা, তুমি এর মধ্যে রয়েছ!

তাই বুঝি!

—তবে চুরিটা নিজের প্রয়োজনে তুমি করেছ বলে অবশ্য আমাদের ধারণা নয়। কিন্তু কার জন্যে, তোমার কোন্ মক্কেলের জন্য করেছ, সেইটাই এখন বের করতে চাইছি। বলা বাহুল্য ঐ গাড়ি চুরি যাওয়া ব্যাপারটা পুলিশকে দেওয়া তোমার যথারীতি একটা ধাপ্পা বলেই আমরা ধরছি!

— আপনাদের এমৎ ধারণার কারণ?

—প্রথমত ও-রকম ধাপ্পা তুমি এর আগে অনেকবার দিয়েছ আমাদের।

—বেশ, মানলাম। তারপর?

দ্বিতীয়ত তোমার গাড়ি পাম-গ্রোভের কাছাকাছি ছিল। তারপর রত্নহারটি চুরি যাওয়ার সময় তোমার সেক্রেটারি সেখানে গিয়েছিল।

—তার মানে কি এই বুঝবো যে, গত মাসের কলিঙ্গ ব্যাঙ্কের ডাকাতিটা আপনারই কীর্তি!

— মানে?

—প্রথমত, আপনার অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই ব্যাঙ্কে। তার ওপর আপনার ভায়রা ভাই ঠিক সেই সময়ে আপনার চেক ভাঙাতে গিয়েছিল সেই ব্যাঙ্কে!

—ঠিক কথা। কিন্তু আমার আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি কলিঙ্গ ব্যাঙ্কে।

—সে কী, আমার আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করেছেন নাকি আপনারা মোজেসের বাড়িতে?

—হ্যাঁ, যে সিন্দুকটা ভাঙা হয়েছে তার গায়ে আঙুলের কয়েকটি ছাপ পাওয়া গেছে। আশা করছি, সেই ছাপ মিলবে তোমার আঙুলের সঙ্গে।

—আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে পুলিশের যদি কোন জ্ঞান থাকে তো সেই ছাপগুলো দেখবে বেশির ভাগ বাঁ-হাতের আঙুলের। অর্থাৎ, চোর ন্যাটা!

—চোরকে দেখছি, তুমি চেনো!

মোটেই না!

—কিন্তু না চিনলে বলছ কী করে, জানছো কী করে যে, চোর ন্যাটা?

—বড় চট্ ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান—আপনাদের গোয়েন্দা-পুলিশদের এই একটা মস্ত দোষ!

—কেন?

—আমার সেক্রেটারিকে যে পিস্তল দেখিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে, সে লোকটা পিস্তল ধরেছিল, আমার সেক্রেটারির কাছে শুনলাম বাঁ-হাতে।

—কিন্তু গাড়ি চুরিটা তোমার ধাপ্পা হলে পিস্তলের প্রশ্নটাই উঠছে না যে!

—তা বটে! কিন্তু ধাপ্পা না হলে—

—ধাপ্পাই। ধাপ্পা নিয়ে আর ধাপ্পা দিয়ো না, বাপু!

—বেশ, তবে ধাপ্পাই!

—তাহলে এখন তোমার সঙ্গে এ-ব্যাপারে আমার একটু কথা হওয়া দরকার!

—তা, কথাবার্তাই তো হচ্ছে।

—না। টেলিফোনে সব কথা হওয়া সম্ভব নয়! আমার অফিসে একবার এস তুমি!

—জামিনের ব্যবস্থা করেই যাব তো?

—গ্রেপ্তার করবার হ'লে লোক পাঠাতাম। এইভাবে ফোন ক'রে ডাকতাম না।

—বেশ তাহলে এমনিই আসব 'খন। কখন যেতে হবে, বলুন।

—সুবিধে মতন এস একবার, যে কোন সময়। বারোটা নাগাদ

আমি একবার যাচ্ছি ব্যারাকপুরে মোজেসের বাড়িতে, তিনটের মধ্যে ফিরে আসব। তার আগে বা পরে। সন্ধের মধ্যে যে কোন সময়ে আসতে পার!

—কিন্তু আমার যেন ধারণা ছিল—ব্যারাকপুরটা কলকাতা পুলিশের এলাকার বাইরে!

- হ্যাঁ, বাইরেই। তবে চব্বিশ পরগণা পুলিশের অনুরোধে আমাদের গোয়েন্দা-দপ্তর ভার নিয়েছে এই মামলার। আজ রবিবার, ছুটির দিন, মাছধরা ফেলে তাই দেখছো না, আসতে হয়েছে অফিসে!

—অফিস-চাকরি ছেড়ে দিয়ে বরং মাছ ধরলে একটা কাজের কাজ করতেন!

—কী রকম?

- মাছের যা দাম বাজারে, চাকরির চেয়ে রোজগার অনেক বেশি হ'ত!

—যা বলেছ!

—হ্যাঁ, আমার গাড়িটা? কোন সন্ধান পেয়েছেন সেটার এখন পর্যন্ত?

—হ্যাঁ, দমদম এয়ারপোর্টে পাওয়া গিয়েছে। গাড়ির খানাতল্লাসি এখনো আমাদের শেষ হয়নি। তোমার পেতে পেতে ধরো পরশু-র আগে নয়। যাক, তাহলে ঐ কথাই রইল। আজ নিশ্চয় তাড়াতাড়ি আসছ তুমি একবার।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে শুরু করলাম এবার।

যখন খুশি একবার সুবিধে মতন গেলেই হবে লালবাজারে—ডেপুটি কমিশনার বাগচির এ-কথাটা হজম করতে যেন একেবারেই রাজি হ'ল না মন।

আসল মতলবটা কী গোয়েন্দা পুলিশের? এলাকে ধরে নিয়ে গেছে

অথচ যার ওপর আসল সন্দেহ, তাকে দয়া করে শুধু পরামর্শের জন্য দপ্তরে যেতে বলছে একবার।

বলেছে যখন, তখন যাওয়া একবার উচিত। না গেলে হয়তো শেষ পর্যন্ত লোক পাঠিয়ে সেই ধরেই নিয়ে যাবে আর ওদিকে হয়তো আটকে রেখে দেবে এলাকে।

আমি গেলেই যে এলাকে ছেড়ে দেবে এমন অবশ্য কোন কথা নেই। সে রকম কোন কথা থাকবার কথাও নয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাদের দু'জনকেই আটকে রাখবে। তাতে অবশ্য মনে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে এলা।

কিন্তু তার আগে বেন মোজেসের সঙ্গে একবার অতি অবশ্য মোলাকাৎ হওয়া দরকার আমার। ন'টা তো বাজে। কথা মতন এতক্ষণ তো তার এসে যাওয়া উচিত আমার অফিসে।

কিন্তু এসেছে কি?

ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম অফিসের নম্বর। বাজনা বাজতে বাজতেই সাড়া ভেসে এল অপরিচিত গলার,--হ্যালো, কাকে চাই?

ভুল হয়নি তো আমার, নম্বর ডায়াল করতে! নিঃসন্দেহ হবার জন্যে তাই জিগ্যেস করলাম -আজ্ঞে, এটা কি গোয়েন্দা কুশল চৌধুরীর অফিস?

—হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?

—আমি?-ব'লে ভাবতে হলো আমাকে। ভাবতে হ'ল তাড়াতাড়ি --বাবুলাল নয়। আর বাবুলাল ছাড়া কে এই সময় আমার অফিসে ব'সে সাড়া দিতে পারেন ফোনের? ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে বললাম - কুশল চৌধুরী আছেন?

—কুশল চৌধুরী?

—হ্যাঁ, তাঁকে দিন।

তিনি একটু কাজে ব্যস্ত আছেন। আপনার নামটা অনুগ্রহ করে বলুন, তাঁকে বলছি।

না, এবার কোনো ভুল নেই। নিশ্চয়ই গোয়েন্দা পুলিশ গিয়ে হাজির হয়েছে অফিসে!

বুঝে আর এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম না। বললাম—ধরুন, এইখানে কথা বলুন। তারপর গলাটা যথাসাধ্য নকল করে বললাম ডেপুটি কমিশনার বাগচি বলছি।

—আমি ইন্‌সপেক্টর ব্যানার্জি কথা বলছি, স্যর! সসম্ভ্রম সাড়া এল সঙ্গে সঙ্গে।

—কী খবর?

—আজ্ঞে, মিঃ চৌধুরী তো এখনো অফিসে আসেন নি, আপনার অর্ডার মতন তাঁর সেক্রেটারিকে নিয়ে এসে আমরা তল্লাসি করছি অফিস।

—পেলে কিছু?

—সবে এসে তল্লাসি শুরু করেছি আমরা। এখনো পর্যন্ত তেমন কিছু পাইনি, স্যর।

—কিছু পেলেই জানিও আমাকে।

আর কথা না বাড়িয়ে নামিয়ে রাখলাম রিসিভার। রেখে তারপর ভাবতে শুরু করলাম আবার।

প্রথম কথা—আমার সেক্রেটারিকে ধরে নিয়ে গিয়ে এবং তার কাছ থেকে চাবিপত্তর নিয়ে খানাতল্লাসি করা হচ্ছে আমার অফিস। অথচ, এদিকে ডেপুটি কমিশনার বাগচি আমাকে আমার সুবিধে মতন শুধু একটিবার যেতে বলছেন লালবাজারে। ব্যাপারটা রীতিমত সন্দেহজনক।

দ্বিতীয়ত, বেন মোজেস আসেনি কেন এখনও অফিসে? এসে থাকলে বাগচিকে সে কথা নিশ্চয়ই বলতো ব্যানার্জি! তবে কি আমার মাথায় পিস্তলের বাঁট মারা ঐ লোকটাই সত্যি বেন মোজেস? রত্নহারটা বাগিয়ে আর প্রয়োজন নেই তার আমার কাছে আসবার!

বাগচিও বলল, দমদমে পাওয়া গিয়েছে আমার গাড়ি। তার মানে, কাল রাতেরই কোন প্লেনে রত্নহার নিয়ে কেটে পড়েছে সে কলকাতা

থেকে। নাইট প্লেন ধরে পৌঁছে স্নানাহার সারছে হয়তো এতক্ষণে দিল্লী, বোম্বে বা মাদ্রাজে!

কিন্তু নিজে গিয়েই যদি চুরি করবে তবে হারটা দেখে আসবার জন্যে পয়সা খরচা ক'রে আমাকে পাঠাবে কেন সে?

আসল উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় ওর হারটা চুরি করানোই। আমাকে রাজী করাতে না পেরে তখন দেখে আসবার কথা বলেছিল। তারপর নিজেই চুরি করার সিদ্ধান্ত করেছে। ক'রে, তারপর আর জানাবার সময় পায়নি।

কিন্তু তাই কি? উহু, তা নয়।

হারটা গোড়া থেকে নিজেই চুরি করবে বলে নিশ্চয় ঠিক করা ছিল ওর। আমাকে পাঠিয়েছিল চুরি যাবার পর চোর হিসাবে ধরা পড়বার জন্য। ঐ ঘরের মধ্যে অজ্ঞান ক'রে আমায় তাই রেখে গিয়েছিল বেন মোজেস।

না, ধরা পড়বার জন্য নয়। ধরা পড়লে হারটা পাওয়া যেত না আমার কাছে। আমার কথা হয়তো তখন পুলিশ কিছুটা বিশ্বাস করতো। আসল উদ্দেশ্য ছিল ওর অন্য।

হ্যাঁ, তাই। বেন মোজেসের আসল উদ্দেশ্য ছিল পাইপ বাইয়ে জানলা ভাঙিয়ে একবার আমাকে উপস্থিত করা ঐ ঘরে - যাতে রত্নহার চুরি যাবার পর সকলের মনে হতে পারে যে, জানলা দিয়েই চোর এসেছিল।

হ্যাঁ, তাই-ই। নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছিল বেন মোজেস ঐভাবে আমাকে ওখানে—সেই সঙ্গে বোধহয় সিন্দুকটাও খুলে দেবার জন্য ওকে!

নাঃ, বেন মোজেসকে এখনই একবার ধরা দরকার। তার খবর নেওয়া দরকার। ফ্যারাডে বোর্ডিং হাউসে সশরীরে যাব, না, ফোন করব?

সঙ্গে সঙ্গে ভাবনায় বাধা পড়ল আমার—ঝনঝন ক'রে পাশে টেলিফোন আবার হঠাৎ বেজে উঠতে।

রিসিভার তুলে সাড়া দিলাম—আমি কুশল চৌধুরী বলছি। আপনি?

—তোমার বন্ধু হ্যারি।

—হ্যারি?

—হ'্যা। কেমন আছ?

—আছি ভালোই, কিন্তু—মাপ করবেন, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না!

—পারছ না! সে কী? তুমি কুশল চৌধুরী—পেশায় বে-সরকারী গোয়েন্দা তো?

—হ'্যা, কিন্তু হ্যারি বলে আমার কোন বন্ধুকে তো আমি মনে করতে পারছি না।

- তাহলে আপনি যে কুশল চৌধুরী তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আর, হ্যারিকে আপনার চেনবার কথা নয়, কেননা হ্যারি আমার মনগড়া নাম। আমি বেন মোজেস।

—বেন মোজেস?

—হ'্যা, আজ সকাল ন'টায় যাবার কথা ছিল যার—আপনার অফিসে।

—কিন্তু বেন মোজেস বলেও তো আমি কারুকে মনে করতে পারছি না। কোত্থেকে ফোন করছেন, বলুন তো? সেটা বললে হয়তো চিনতে পারি!

—ভয় নেই, আপনার অফিস থেকে নয়। আপনার অফিসে ঢুকতে গিয়ে বিল্ডিং-এর সামনে পুলিশের গাড়ি দেখে কেমন সন্দেহ হয় আমার। চলে এসে বাইরে থেকে তখন ফোন করি আপনার অফিসে।

—তারপর?

- যে সাড়া দেয়, সে বলে যে, আপনি ব্যস্ত এবং সেই সঙ্গে আপনাকে বলবার জন্য নাম জানতে চায় আমার। গলাটা মেয়ের হলেও ভাবতে পারতাম আপনার সেক্রেটারির, কিন্তু তা নয়। গলা পুরুষের এবং বেশ জবরদস্ত।

—পুলিশের গলা তো জবরদস্ত হবেই।

- পুলিশের?

হ্যাঁ। তারপর বলুন—

তা ঐ পুরুষকণ্ঠ শুনে সন্দেহ বেড়ে গেল আমার এবং তখন আপনার বন্ধু হ্যারি ব'লে নিজের পরিচয় দিলাম আমি। আশ্চর্য, তার একটু পরে জবাব পেলাম যে, আপনি ফোনে আসতে পারছেন না তবে আমি যেন এখনি আপনার অফিসে চলে আসি, বিশেষ নাকি দরকার পড়েছে। শুনে, এখুনি আসছি ব'লে আমিও ফোন ছেড়ে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে।

—বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন!

—হ্যাঁ, তাই দেখছি! তারপর গাইডে আপনার বাড়ির নম্বর দেখে এই ফোন করছি। ভয় হয়েছিল, হয়তো এখানেও ঐ একই অবস্থা হবে। যাক পেয়ে গেছি আপনাকে!

শুনে মনে মনে বললাম—কে কাকে পেয়েছে, তুমি আমাকে, না, আমি তোমাকে—সেটাই প্রশ্ন! তারপর মনের ভাব গোপন ক'রে বললাম বলুন, কী খবর?

—আজ সকালে খবরের কাগজে খবরটা পড়ার পর থেকে ভীষণ দুর্ভাবনায় রয়েছি আমি। তাড়াতাড়ি এখন বলুন—আপনার যা করবার কথা ছিল, সেটা ক'রে এসেছেন তো কাল?

—হ্যাঁ।

—বাঁচালেন! অবিশ্যি, আমি কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম যে, আপনার গাড়ি-চুরির ব্যাপারটা একটা ধাপ্পা।

—না, সেটা ধাপ্পা নয়!

—ধাপ্পা নয়?

—না।

—তার মানে? কাল রাতের ব্যাপার খবরের কাগজে যা পড়েছি—সেগুলি সব সত্যি?

- আপনি এখন কোথায়?

—পার্ক ষ্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয়।

—কতোক্ষণের মধ্যে আসতে পারবেন আমার ফ্ল্যাটে?

—দশ মিনিট। কিন্তু যাওয়াটা কি উচিত হবে?

—কেন?

—পুলিশ হানা দিতে পারে আপনার বাড়িতে যে কোন মুহূর্তে। আর হানা না দিলেও, নজর রাখছে নিশ্চয়ই আপনার বাড়ির ওপর—কে যাচ্ছে, কে আসছে—লক্ষ্য করছে নিশ্চয়। তার চেয়ে আপনি আসুন না কোথাও!

—কোথায়?

—নিউ এম্পায়ার-এ।

—সিনেমায়?

—হ্যাঁ, আজ রবিবার মর্নিং শো রয়েছে। বুকিং অফিসে হ্যারির নাম ক'রে টিকিট রেখে দেবো আমি। আপনি এসে হ্যারি নাম বললেই পাবেন। তারপর শো আরম্ভ হ'লে তবে হল এ আলাদা আলাদা ঢুকব দু-জনে। কথা-বার্তা, কাজকর্ম সব ওই হল-এর অন্ধকারের মধ্যেই সেরে নেওয়া যাবে। তার পর শো ভাঙবার অনেক আগেই আবার অন্ধকারের মধ্যেই আলাদা আলাদা বেরিয়ে আসব আমরা। ...কী, শুনছেন আমার কথা?

আমি বললাম - হুঁ।

—তাহলে একসঙ্গে আমাদের দু-জনকে দেখতেও পাবে না কেউ? ব্যবস্থাটা আপনার কেমন মনে হচ্ছে? নিরাপদ মনে হচ্ছে কি—আমাদের উভয়ের পক্ষে?

—হ্যাঁ।

—আসছেন তাহলে?

—হ্যাঁ, আসছি।

—জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে আসছেন তো!

শেষের কথাটা যেন শুনতে পাইনি, এমনভাবে আমি কেটে দিলাম ফোন। কেটে দিয়ে তখনই ফোন থেকে রিসিভারটা নামিয়ে

রাখলাম—আবার যাতে ফোন না করতে পারে বেন মোজেস আমাকে ! উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। তাড়াতাড়ি তৈরি হতে শুরু করলাম বের হবার জন্য।

দাড়ি কামাতে ব'সে গালে সাবান লাগাতে লাগাতে হঠাৎ একটা খট্‌কা লাগল মনে !

ফোনে যতখানি বোঝা যাচ্ছে, গলাটা মিলছে বেন মোজেসের সঙ্গে, কথাগুলিও যা বলছে, বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু কালকের রাতের ঘটনা ও কি জানে না ! না, না-জানার ভান করছে ?

ওর মুখ যাতে দেখতে না পাই, দেখে আমার ঘুসির চিহ্ন দিয়ে চিনতে না পারি, তাই কি কায়দা করে সিনেমার অন্ধকারে দেখা করতে চাইছে আমার সঙ্গে !

পিস্তলটা গুলি ভ'রে সঙ্গে নেওয়াটা বোধহয় এবার বুদ্ধিমানের কাজ হবে !

নিউ এম্পায়ার-এ গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন মর্নিং শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। হ্যারির নাম বলতে টিকিট পাওয়া গেল একটা—বক্সের টিকিট।

টিকিটটা উল্টে দেখতে দেখতে জিগ্যেস করলাম টিকিট ঘরের লোকটিকে কতক্ষণ পড়ে আছে টিকিট ?

—আধ ঘণ্টা ! উত্তর দিল কাউন্টারের লোকটি।

—যে রেখে গেছে তার চেহারা কেমন বলতে পারেন মানে, একটা ব্যাপার আছে !

শুনে একটু যেন অবাক হয়ে গেল লোকটি। বলল - কেন আপনি চেনেন না ?

– চিনি তো নিশ্চয়ই ! হেসে জবাব দিলাম আমি - তবে মজাটা, বন্ধুদের মধ্যে সঠিক কোন্ জন করছে, সেটাই শুধু জানবার চেষ্টা করছিলাম। যাক গে, হল-এ ঢুকলেই তো এখনি দেখতে পাব, জানতে পারব, কে !

ব'লে আর দাঁড়ালাম না আমিও, কোনরকমে মুখ রক্ষা ক'রে

তাড়াতাড়ি স'রে এলাম টিকিট-ঘর থেকে। এসে আশে পাশে ভাল-ভাবে তাকিয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ—বেন মোজেস অপেক্ষা করছে নাকি ধারে কাছে কোথাও!

না কোথাও তার টিকিরও সন্ধান নেই। বৃথা আর সময় নষ্ট না ক'রে তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম দোতলায়!

সিঁড়ির মাথায় আমার হাত থেকে টিকিট নিয়ে বক্সগুলির দিকে আমাকে নিয়ে চলল গেট-কীপার। তারপর একটি বক্সের বাইরে দাঁড়িয়ে টিকিটের আধখানা ছিঁড়ে আমার হাতে দিয়ে বক্সের দরজা খুলে টর্চের আলোয় দেখিয়ে দিল আমার সীটটা। তারপর আমি ঢুকে গিয়ে সীটে না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল লোকটি আলো দেখিয়ে।

না, বক্স-এ নেই আর কেউ। বেন মোজেস নিশ্চয়ই বাইরের লবিতে কোথাও অপেক্ষা করছে। আমি এসে ঢোকবার পর এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে এসে ঢুকবে!

ব'সে ছবি দেখতে লাগলাম, বেন মোজেসের অপেক্ষায়। সংবাদচিত্র দেখানো হচ্ছে তখনও। তারপর সেটা শেষ হয়ে তথ্যচিত্র দেখানো শুরু হ'ল একটা। তখনও বেন মোজেসের কোন পাত্তা নেই।

তথ্য-চিত্র দেখছি বটে ব'সে ব'সে, কিন্তু তার থেকে একটি তথ্যও প্রবেশ করছে না আমার মগজে। কী করে করবে? মন যে পড়ে রয়েছে বক্সের দরজায়। কখন বেন মোজেস আসবে, কখন আওয়াজ পাব দরজাটা খোলবার!

হঠাৎ বক্সের দরজাটা টেনে খুলে ধরল যেন কে! খুলে ভেতরে ঢুকল না, দাঁড়িয়েই বলল, মিঃ চৌধুরী!

অপরিচিত গলা শুনে পকেটে পিস্তলটা বাগিয়ে ধ'রে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, গেট-কীপারটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ফিরে তাকাতেই বলল—আপনি মিঃ চৌধুরী?

উত্তর করলাম—কেন?

—ফোন এসেছে, আপনার!

—ফোন? কোত্থেকে?

—জানি না। ধরবেন চলুন, ম্যানেজারের ঘরে।

—চলুন।

সীট ছেড়ে উঠে পিছন পিছন চললাম গেট-কীপারের। দোতলাতেই ম্যানেজারের ঘর। গিয়ে ঢুকতেই দেখলাম, ম্যানেজার বা ম্যানেজারের মতনই একজন ব'সে রয়েছে একটা টেবিলে। ব'সে কাজ করছে এবং তার হাতের পাশেই রিসিভার নামানো রয়েছে টেলিফোনের। আমি ঢুকতেই মুখ তুলে তাকালো ম্যানেজার—মিঃ চৌধুরী?

—হ্যাঁ।

—এই নিন! বলে রিসিভারটা এগিয়ে দিল ম্যানেজার। বাড়ি থেকে ফোন এসেছে আপনার।

—বাড়ি থেকে? রিসিভারটা নিতে গিয়ে বিস্ময়ের ধাক্কায় প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে।

—হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী।

স্ত্রী! প্রথমে মনে হ'ল অন্য কারুর ফোন, ভুল ক'রে ডেকেছে আমায়। কেননা, স্ত্রী ব'লে কোন বস্তু আমার নেই। আর সেই থাকা-না-থাকা ছেড়ে দিলেও কারুরই তো জানবার কথা নয় এখন, এই মুহূর্তে আমি নিউ এম্পায়ার-এ ব'সে সিনেমা দেখছি—এক আমার মক্কেল বেন মোজেস ছাড়া!

আর সেটা ম্যানেজারকে বলতে যাচ্ছি, হঠাৎ কেমন মনে সন্দেহ হ'ল—হ্যারির মতন বেন মোজেসের এটাও নতুন কোন একটা চাল নয় তো? ভাবতে ভাবতে রিসিভারে স্পষ্ট বাংলায় সাড়া দিলাম হ্যালো, আমি চৌধুরী বলছি। কে?

নারী কণ্ঠের উত্তর এল—স্পষ্ট ইংরেজিতে—আপনি হ্যারি চৌধুরী কি?

বেন মোজেসেরই চাল—সন্দেহ নেই আর। এবার ইংরেজিতে বললাম—হ্যাঁ! তা, তিনি কোথায়?

—নারীকণ্ঠের সাড়া এল—কার কথা বলছেন? তার নামের আদ্যাক্ষর গুলি বলুন তো একবার?

ঠিক বোধহয় বলতে পারছি না। তবু কাছাকাছি বলবার চেষ্টা করছি, শুনুন—সি. এন।

উত্তরে বেন মোজেসের পরিচিত গলা কানে এল - সি, এন-এর কাছাকাছি বি, এম অর্থাৎ বেন মোজেস কথা বলছি। আপনাকে একটি লোক অনুসরণ করছে।

—কখন?

— আপনি যখন নিউ এম্পায়ারে ঢুকছিলেন!

—কীরকম চেহারা?

—দেখে মনে হ'ল লোকটা পুলিশেরই। তাই আর আমি ঢুকিনি হল এ!

—হুঁ। এখন কোত্থেকে বলছেন?

—হল্ থেকে চলে এসেছি আমি। এখন একটা হোটেল থেকে কথা বলছি।

—কোন্ হোটেল?

—কেন?

—আমি টিকটিকিটিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এখুনি সেখানে চলে আসতে পারি।

—পারলেও সেটা কি উচিত হবে? আমার মনে হয়, এখন দু'-চারদিন যোগাযোগ করা মোটেই উচিত হবে না আমাদের। যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আমাদের উভয়েরই!

—হুঁ।

—ব্যাপারটা একটু থিতোলে আমিই যোগাযোগ করে নেব আপনার সঙ্গে!

—কিন্তু—

—না, এখন দেখা করবার উপায় নেই। একটু দেরি করতেই হবে। ততদিন জিনিসটা সাবধানে রাখবেন আপনার কাছে। আর, সে-জন্য

অতিরিক্ত পারিশ্রমিকও কিছু নিশ্চয়ই দেব আপনাকে। কিন্তু যা বললাম, খেয়াল থাকে যেন!

—ধন্যবাদ। কিন্তু—

—আর কথা বলতে পারছি না। একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। আবার দেখা হবে। বাই বাই!

ব'লে আমি আর কিছু জানবার, কিছু বলবার আগেই ফোন কেটে দিল বেন মোজেস।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এলাম ম্যানেজারের ঘর থেকে। বেরিয়ে এলাম ভাবতে ভাবতে।

তুখোড় লোক বেন মোজেস। আমার ওপর পুলিশ নজর রেখেছে —সেটা আমি বুঝতে না পারলেও, বেন মোজেসের নজর এড়ায়নি। ফোনটা যাতে পুলিশ না ধরে তার জন্য তার সাবধানতাও তারিফ করবার মতন।

এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে—এলার কাছে গেলেও কেন আমার কাছে আসেনি পুলিশ। রত্নহার যদি আমি চুরি করে থাকি তো তবে সেটা যে নিজের জন্য নয়, সেটা বুঝেছে পুলিশ, বুঝে আমার রত্নহারের মক্কেলটি কে, সেটা জানবার জন্যেই আমাকে এই ভাবে ছেড়ে রেখেছে।

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে সেই মক্কেল, কিম্বা সেই মক্কেলের সঙ্গে আমি যে একবার যোগাযোগ করবোই, বামাল হস্তান্তর করবার জন্যে—এই ভেবেই এভাবে ছেড়ে রেখে আমার ওপর কড়া নজর রেখেছে পুলিশ। তারপর সেই বামাল হস্তান্তরের সময় তখন বামালসুদ্ধ আমাকে ও সেই মক্কেলকে একসঙ্গে হাতেনাতে ধরবে পুলিশ।

ডেপুটি কমিশনার বাগচির টেলিফোনের অর্থটাও স্পষ্ট বোধগম্য হ'ল এবার আমার কাছে। পুলিশ একেবারে আমাকে কিছু বলছে না দেখলে, স্বভাবতই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠব আমি। আর সন্দিগ্ধ হলেই সতর্ক হয়ে যাব, মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবার ব্যাপারে। তাই ওইভাবে ফোন ক'রে আমাকে অসন্দিগ্ধ ও নিঃশঙ্ক রাখতে চেয়েছেন তিনি।

কিন্তু আমার অনুসরণকারী সেই টিকটিকিটি কোথায়? এই

সিমেমারই কোথাও রয়েছে নিশ্চয়। এমন কোথাও, যেখান থেকে নজর রাখতে পারছে সে আমার ওপর সব সময়ে। ম্যানেজারের ঘরে ফোন ধরতে যাবার জন্য বক্স থেকে বেরিয়ে লবিতে এসেই প্যাণ্ট ও হাওয়াই শার্ট-পরা একজনকে দেখেছিলাম বটে, চট করে কল-ঘরে ঢুকে যেতে।

সে-ই কি তাহলে? কলঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে রয়েছে কি সে এখনও? দেখা যাক···

না, কল-ঘর খালি।

আমার ম্যানেজারের ঘরে যাওয়াটাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে সে এবং গেট-কীপারকে জিগেস ক'রে ইতিমধ্যে জেনেও ফেলেছে নিশ্চয়ই ফোনের কথা।

তা জানুক। সেই সঙ্গে টেলিফোনে পাওয়া খবরটুকুও কি জেনেছে? সিনেমা হাউসের টেলিফোনগুলি ডবল লাইনের এবং ইণ্টারকম্যুনিকে-শনের হয়ে থাকে। ম্যানেজারের ঘরেরটাও তাই। তার মানে, হয়তো জেনেছে। অন্তত আমাকে তাই ধরে নিয়ে এগোতে হবে এখন।

কিন্তু জেনেছে ধরলে কী কর্তব্য হবে এখন আমার?

কিছুই না। যেমন অনুসরণ করেছে, তেমনি অনুসরণ করুক সে আমাকে। ভাল করেই অনুসরণ করুক। নিশ্চিন্তমনে ঐ বক্সে ব'সে ছবিটা দেখি আমি। তারপর এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও কিছু খেয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এলার কাছে। হ্যাঁ, তার আগে একটা ফোন করতে হবে এলার হট্টেল-এ—এলার খবরটা সবাইকে জানিয়ে রাখবার জন্যে।

ভাবতে ভাবতে আবার ফিরে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ঢুকলাম বক্সে। ভিতরে পা দিতেই পাঁজরার কাছে শক্ত নলের মতন কিসের যেন খোঁচা লাগল একটা। চাপা ধমকও একটা কানে এল সেইসঙ্গে।

—কোন রকম চালাকির চেষ্টা করো না। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো রয়েছে। ছুঁড়লে একটা চেয়ার সরানোর চেয়ে বেশি আওয়াজ হবে না।

শুনতে শুনতে এবং সেই সঙ্গে বাইরের আলো থেকে হঠাৎ এসে

অন্ধকারে ধাঁধিয়ে যাওয়া আমার দৃষ্টি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসতে দেখতে পেলাম মানুষটাকে। বক্সের একধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

বললাম - কী চাও তুমি ?

চাপা গলায় উত্তর শোনা গেল বলছি। আগে চেয়ারে গিয়ে ব'স।

চাপা গলা হলেও শুনতে ও চিনতে ভুল হয়নি আমার। আইজাক মোজেসের বাড়িতে সিন্দুকের ঘরে আমার মাথায় কাল রাতে পিস্তলের বাঁট-মারা সেই লোকটাই। এখানেও এখনও পিস্তলটা ধ'রে রয়েছে বাঁ হাতে !

ভাবতে ভাবতে গিয়ে বসলাম চেয়ারে। ব'সে বেশ হৃদ্যতার সুরে কুশল প্রশ্ন করলাম—বাঁ-চোখের আঘাতটা কেমন আছে তোমার ? অন্ধকারে হাত চালিয়ে ঠিক ঠাহর পাই নি। চোখের কোন ক্ষতি হয়নি তো ?

—না।

—বাঁচালে ! চোখ বলে কথা একটা গেলে কানা, দুটো গেলে অন্ধ।

—প্রাণ কিন্তু মানুষের একটাই ! আর একটা গেলেই, একবার গেলেই হয়ে গেল !

—হ্যাঁ জন্মের মতন।

—তাহলে এখন যা জিগ্যেস করব—

—তার চটপট উত্তর দেব, এই তো ?

—সঠিক উত্তর আর শুধু উত্তরটুকুই—বাজে কথা বলবার চেষ্টা করবে না। অবিশ্যি, যদি ইন্টারভ্যালের পরও ছবিটা দেখবার আদৌ ইচ্ছে থাকে তোমার।

- ছবি দেখবার ইচ্ছে আদপেই নেই। তবে বেঁচে থাকবার ইচ্ছে পুরো ষোলো আনা ! এখনকার হিসেবে পুরো একশো নয়া পয়সাও ধরতে পারো।

– সেই বেঁচে থাকার কথাই বলছি। নাও, এবার সুবোধ বালকের মতন বলো তো হারটা কোথায়?

শুনে সত্যিই আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম হার। কোন্ হার? কালকের ওই হারটা?

– আবার কোন্‌টা? সেই সঙ্গে পিস্তলের নলটা এবার ঠেকল এসে একেবারে কানের পাশে কী, এখনও কি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কোন্ হারের কথা বলছি?

– না।

– কোথায় সেটা?

—সেটা তো তুমি পিস্তলের বাঁট মেরে আমায় অজ্ঞান ক'রে নিয়ে চলে এসেছিলে – কাল রাতে!

– ন্যাকামি রাখো। খুব ধাপ্পা দিয়েছিলে আমাকে কাল রাতে। অবিশ্যি, রাতে বলেই দিতে পেরেছিলে। আজ সকাল হতেই হারটা যে নকল সেটা বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হয়নি আমার। একবার দেখেই নকল বুঝতে পেরেছি।

— নকল?

– হ্যাঁ, নকল। এখন ন্যাকামি রেখে, চালাকি ছেড়ে আসল হারটা কোথায়, বলো।

– আমি জানি না।

– জানো না?

—না।

– বেঁচে থাকবার এতটুকু ইচ্ছে তোমার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, আমার!

ঐ সঙ্গে পিস্তলের সেফটি-ক্যাচটা খোলবার আওয়াজও কানে এল আমার। তাড়াতাড়ি বললাম – না-না, সে-ইচ্ছে যথেষ্টই আছে।

– তাহলে বলো!

—আচ্ছা, এই সহজ কথাটা কেন বুঝছো না যে, হারটা নকল বলেই যদি জানবো সেটা আমি চুরি করতে যাব কেন?

– কে বলল, বুঝছি না? আমিও তো বলছি, নকল হার চুরি যাবার মতন বোকা মানুষ কুশল চৌধুরী নয়।

– ভালো করেই চেনো দেখছি, আমায়?

– বাধ্য হয়ে চিনতে হয়েছে। তোমার গাড়ি-চুরির খবর প'ড়ে ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম – পাইপ বেয়ে ওঠা মানুষটা তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। তারপর তোমার গাড়ির নম্বর নিয়ে অটোমোবাইল এসোসিয়েশন থেকে আজ রবিবার ছুটির দিনে তোমার নাম-ঠিকানা বের করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমাকে!

এই সিনেমা হাউসে আমার সন্ধান করলে কী করে?

– তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম কিন্তু ভেতরে ঢোকবার আগেই তোমাকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরতে দেখলাম। সেই থেকে পিছু নিয়েছি, এসে ধরেছি এইখানে। আমার হাত থেকে পালাতে যে পারবে না, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এখন আসল হারটা আমায় দেবে, না, মরবে?

– কোত্থেকে দেব? আমার কাছে থাকলে তো?

– কাকে দিয়েছো হারটা?

– পেলে তো দেব কারুকে! তা ছাড়া, বললে তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না – কাল রাতে আদপেই হার চুরি করতে যাইনি আমি ওখানে!

– হার চুরি করতে যাওনি? কী জন্যে ঢুকেছিলে তবে ঐ বাড়িতে পাইপ বেয়ে? আর, সিন্দুক – সেটাই বা ভেঙেছিলে কী জন্যে? সে কী, ওই নকল হারের শুধু রূপসুধাটুকু পান করতে?

– হ্যাঁ, তাই। তোমার কাছে পুরোপুরি অবিশ্বাস্য শোনালেও আসলে নির্জলা সত্যি কথাটা তাই-ই। বলো তো, ব্যাপারটা খুলে বলতে পারি, তোমায়। কী, শুনবে?

– তোমার ওই আষাঢ়ে গল্প শোনবার জন্যে আমি এখানে আসিনি।

— যেটাকে আষাঢ়ে বলছ, একটু ধৈর্য ধরে শুনলে হয়তো সেটা অন্য রকমও মনে হতে পারে!

—না পারে না।

— না-শুনেই সেটা কী করে বলছ?

শুনে একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেল মানুষটা। তারপর বলল— আচ্ছা, বলো।

— তবে শোনো, সত্যিই আমি কাল চুরি করতে যাইনি। আমার এক মক্কেলের হয়ে আমি আসলে দেখতে গিয়েছিলাম— সত্যিই ওই রত্ন-হারটা ওই সিন্দুকে রয়েছে কিনা!

—শুধু দেখতে?

—হ্যাঁ, শুধু দেখতেই!

— সিন্দুকের মধ্যে হারটা যে নকল সেটা তুমিও জানতে না?

— না। জানলে কি আর—

—গল্পটা তোমার শুধু আষাঢ়ে নয়, একেবারে মুড়ি দিয়ে খাবার তেলে ভাজা!

—আমার পরিচয় যখন জেনেছো তখন এ-ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে কানের পাশে সাইলেন্সার-লাগানো সেফটি-ক্যাচ খোলা পিস্তল নিয়ে আষাঢ়ে গল্প শোনানোর মতন চৈতন গোয়েন্দা কুশল চৌধুরী নয়!

— হুঁ। তা, তোমার সেই মক্কেলের নামটা শুনি?

—নাম বলাটা দস্তুর নয় আমার পেশায়— পিস্তল উঁচিয়ে ছাড়া কথা বলা যেমন দস্তুর নয়, তোমার।

— তুমি না বললেও নামটা বোধ হয় আমি আন্দাজ করতে পারছি, মিঃ চৌধুরী।

—পারা উচিত! তোমার চেহারাটা ভালো ক'রে দেখবার খুব একটা সুযোগ হয়নি আমার। কিন্তু কথাবার্তা শুনে তো বিলক্ষণ বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছে।

—বাক্যবাগীশ তুমিও কম নও। আর তাই বিশ্বাস করতে তোমার

বাঁধছে। যা হোক, যদি এখন সত্যি কথা ব'লে থাকো তো বেঁচে গেলে তুমি।

—তাহলে এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম ধরতে পারি!

—হ্যাঁ। আর যদি মিথ্যে বলে থাকো তো - তোমার পরিচয় জানা রইল আমার। জেহোবা-র দিব্যি – তোমায় তাহলে জবাই করে খুন করব আমি।

—বেশ, তাই ক'রো। আর, যাতে তাই করতে পারো তার জন্যে আপাতত এখন দয়া ক'রে পিস্তলের নলটা একটু আলগা করো, কানের পাশ থেকে। ফুটো হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে জায়গাটার!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে পিস্তলটা সত্যিই আল্‌গা করে নিল লোকটা। তারপর বলল -নাও, বসে এবার ছবি দেখো তুমি!

আর বলেই লোকটা পিস্তলের বাঁট দিয়ে আবার মাথায় আঘাত করল আমার।

আর, কালকের সেই ব্যথা-জায়গাটাতেই!

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম, জানি না। যখন চোখ মেললাম, দেখলাম চেয়ারের ওপর কাত হয়ে প'ড়ে রয়েছি। বক্সে আমি একা— পিস্তলধারী চ'লে গিয়েছে। সামনে পর্দায় ছবি চলছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বোঁ ক'রে ঘুরে গেল মাথাটা। ব'সে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে - একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে।

জিরিয়ে তারপর চেয়ার ধ'রে, বক্সের দেওয়াল ধ'রে ধ'রে পা-পা করে কোন রকমে বেরিয়ে এলাম অন্ধকার বক্স থেকে। বাইরের আলোতে এসে দাঁড়াতে টন-টন করে উঠল চোখ আর সেই সঙ্গে দপ-দপ করতে লাগল মাথার পেছনটা।

হাতের ঘড়িটা দেখলাম। বেশিক্ষণ নয়। মাত্র মিনিট ছয়েক অজ্ঞান হয়েছিলাম।

টলতে টলতে গেট-কীপারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, জিগ্যেস করলাম ইন্টারভ্যালের কত দেরি?

—এইবার হবে! আমার দিকে তাকিয়ে—আমার টলটলায়মান অবস্থা দেখে বেশ অবাক হয়ে বলে উঠল গেট-কীপার—আপনি কি অসুস্থ?

—হ্যাঁ। টয়লেটটা কোন্ দিকে?

গেট-কীপার দেখিয়ে দিয়ে বলল—আপনাকে ধরবো কি? ধরে নিয়ে যাব?

—না। ঠিক আছে, মানে, এখনি ঠিক হয়ে যাব আমি। ব'লে টলতে টলতেই ঢুকলাম গিয়ে কল-ঘরে। কল থেকে আঁজলা ক'রে জল নিয়ে মাথায় দিতে লাগলাম। কয়েকবার দিতে তবে একটু যেন সুস্থও বোধ হতে লাগল। তারপর রুমাল বের ক'রে মাথাটা একটু মুছে বেরিয়ে এলাম কল-ঘর থেকে। এসে ব'সে পড়লাম একটা সোফায়। হাত দিয়ে সংকেত ক'রে গেট-কীপারটিকে আবার ডাকলাম। সে এসে কাছে দাঁড়াতে বললাম, একটা টেলিফোন করতে চাই আমি। ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

—পাবলিক টেলিফোনের একটা বুথ রয়েছে নিচে!

—থ্যাংক্যু।

গেট-কীপার কিন্তু নড়ল না। বেশ সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বলল, কিন্তু আপনার যা অবস্থা দেখছি তাতে সিঁড়ি দিয়ে এখনি নামতে পারবেন কি?

—আরেকটু না জিরিয়ে নিয়ে নামতে সাহস হচ্ছে না। তা, ম্যানেজারের ঘর থেকে করা যায় না, ফোনটা?

—সরি, হুকুম নেই।

—একবার ওকে গিয়ে আমার অবস্থাটা ব'লে দেখুন না!

—ম্যানেজার এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। থাকলে হয়তো হতো, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া! দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল গেট-কীপার।

—ফোনটা বড়ই জরুরী!

—আচ্ছা, আসুন!

সোফা থেকে উঠে– একটু টলতে টলতেই গেট-কীপারটির সঙ্গে গিয়ে আবার ঢুকলাম ম্যানেজারের ঘরে। চেয়ারে ব'সে টেবিল থেকে টেলিফোন গাইডটা টেনে নিয়ে পাতা উল্টে বের করলাম নামটা। সেই সঙ্গে ঠিকানাটাও—বেন মোজেসের সেই উকিলের, যে নাকি আমার কাছে পাঠিয়েছে বেন মোজেসকে সব মুস্কিল-আসানের ভরসা দিয়ে।

তারপর নম্বর ডায়েল করতেই সাড়া ভেসে এল একটি চাঁছা গলার – স্যাম ডেভিড স্পিকিং।

—নমস্কার! আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে আমার। একটু বিশেষ রকমের বিশেষ প্রয়োজন। তা, আপনি কি এখন খালি আছেন?

—আপনি কে বলছেন?

– সেটা ফোনে বলার একটু অসুবিধা আছে।

— হুম্। তা, আপনার প্রয়োজনটা কী জাতীয়?

—আপনার সঙ্গে দেখা হলেই সব বিস্তারিত খুলে বলতে পারব। আমার দায়টা যদি উদ্ধার ক'রে দিতে পারেন, যে পারিশ্রমিক আপনি চাইবেন, আমি দিতে প্রস্তুত।

—হুম্। কখন আসতে চান, আপনি?

– আপনি খালি থাকলে এই মুহূর্তে। তবে লোকজন থাকলে আসতে পারব না। আপনার ওখানে কেউ আমাকে দেখে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।

– হুম্, বুঝেছি। তা, এখন কোত্থেকে ফোন করছেন? মানে, এখন আপনি কোথায়? মিনিট পনেরোর মধ্যে আমার এখানে এসে পৌঁছোতে পারবেন কি?

– যে-রকম বিপন্ন আমি, তাতে পারবেন নয়, মিঃ ডেভিড— আমাকে পারতেই হবে।

– তাহলে চলে আসুন!

—অশেষ ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। গেট-কীপারটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ-করে কথাগুলি শুনছিল আমার! কী বুঝছিল, সে-ই জানে। তার হাতে টেলিফোনের চার্জটা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নিচে—সাবধানে রেলিং ধরে ধরে। নেমে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

তারপর একটু অপেক্ষার পর খালি একটা ট্যাক্‌সি সামনে পেতেই থামিয়ে উঠে বসলাম। ড্রাইভারকে বউবাজার স্ট্রিটের একটা ঠিকানা ব'লে পেছনের গদিতে মাথাটা একটু হেলান দিয়ে রাখতে গেলাম।

রাখতেই ঝনঝন করে উঠল আবার মাথাটা। তাড়াতাড়ি সীটে স্তটস্থ হয়ে উঠে বসতে হলো আমাকে।

বউবাজার ঠিকানায় পৌঁছে তো মুস্কিলে পড়লাম।

ফটকের গায়ে নেম-প্লেট প'ড়ে জানতে পারলাম—বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকে স্যাম ডেভিড। অথচ ওপরে ওঠবার সিঁড়িটা ভীষণ খাড়া—একসঙ্গে উঠে গেছে একেক তলা! শরীরের এই অবস্থায় পারব কি আমি এই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে? মাথায় এই যন্ত্রণা নিয়ে?

বকশিশের লোভ দেখিয়ে ট্যাক্‌সি-ড্রাইভারকে দাঁড় করিয়ে রেখে তারপর সাবধানে ভাঙতে লাগলাম সিঁড়ি। কিছুটা উঠি আবার একটু দাঁড়াই জিরিয়ে নিতে। তারপর তিনতলায় পৌঁছে জিরিয়ে নিলাম বেশ কিছুক্ষণ।

জিরিয়ে, সুস্থ বোধ করে তারপর ডান হাতে পকেটের মধ্যে পিস্তলটা চেপে ধরে বাঁ-হাতে বেল টিপলাম 'স্যামুয়েল, ডেভিড' নামের ফলক-আঁটা দরজায়।

বেল বাজাতেই চেয়ার সরাবার আওয়াজ পেলাম ঘরের মধ্যে। তারপর একটা পায়ের আওয়াজ দরজার কাছে এসে থামতেই উল্টো মুখ হয়ে ফিরে দাঁড়ালাম আমি। আর, ওইভাবে ফিরে দাঁড়িয়ে দরজাটা খোলবার আওয়াজ হতেই গলা বিকৃত ক'রে প্রশ্ন করলাম—স্যাম ডেভিড আছেন?

—আমি স্যাম ডেভিড। আপনিই কি ফোন করেছিলেন একটু

আগে ? জবাব এল পেছন থেকে। মানুষটাকে তো মোটেই জোয়ান মনে হ'ল না গলা শুনে !

—হ্যাঁ, আমিই করেছিলাম।

—তাহলে ভেতরে আসুন।

—ঘরের মধ্যে রয়েছে অন্য কেউ ?

—না। আপনার কথা মতন সবাইকে সরিয়ে দিয়েই আমি অপেক্ষা করছি।

—তাহলে চলুন !

আর তারপর ভেতরে যাবার জন্যে স্যাম ডেভিড পেছন ফিরতেই ডান পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে ব'লে উঠলাম - তবে রে ব্যাটা ছুঁচো !

শুনে স্যাম ডেভিড অবাক হয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াতেই পিস্তলের নলটা তখন চেপে ধরলাম তার বুকে। হতভম্ব হয়ে গেল প্রথমে স্যাম ডেভিড। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে চোখ দুটো গোল গোল হয়ে এলো তার। আর ততক্ষণে তাকে পিছু হাটিয়ে নিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়েছি। তারপর পিস্তলের নলের মুখে রেখে স্যাম ডেভিডকে দিয়ে বন্ধ করলাম ঘরের অন্দরের দিকে দরজা। দরজা বন্ধ ক'রে স্যাম ডেভিড ফিরে দাঁড়াতে অকারণেই তার পেটে পিস্তলের একটা আচম্‌কা খোঁচা মারলাম। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল স্যাম ডেভিড।

দেখে হেসে বললাম—আমাকে তুমি বিলক্ষণ চেনো, বন্ধু। যা জিগ্যেস করব, যা বলব তা না করলে যে এখন স্রেফ খুন ক'রে রেখে যাব তোমায়, সেটাও নিশ্চয়ই পরিস্কার বুঝতে পারছো। পিস্তলে যে সাইলেন্সার লাগানো, সে তো দেখতেই পাচ্ছো। তার চেয়ে বড় কথা, আর কেউ ঢুকতে দেখেনি আমাকে এখানে, বের হতেও আশা করি দেখবে না !

—কী চাও বলো—কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করল স্যাম ডেভিড, পেটের যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে।

—চাই আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর এবং তারপর বেন মোজেসকে নিয়ে যে মারাত্মক খেলা তুমি খেলছো, সে সম্বন্ধে একটা লিখিত স্বীকারোক্তি।

—কে বেন মোজেস?

পিস্তলের নলটা দিয়ে আবার একটা খোঁচা দিলাম বেন মোজেসের পেটে—কী, মনে পড়েছে?

প্রায় খাবি খেতে খেতে বেন মোজেস ঘাড় কাৎ করল।

—রাজী আছো আমার কথায়?

—ওকালতির লাইসেন্স তাহলে চলে যাবে আমার। হাঁপাতে হাঁপাতে ব'লে উঠল বেন মোজেস, জেলও হয়ে যাবে হয়তো!

—হয়তো কেন, ধরো হবেই। তবে প্রাণ যাওয়ার চেয়ে কি সেটা ভাল নয়?

—কিন্তু।

—কিন্তুটা পাচ্ছো কোথায়? আমি পিস্তলটা দেখিয়ে ধমকে উঠলাম, বলো তো আরেকটু সুড়সুড়ি দিই তোমার পেটে। যথেষ্ট আরাম তোমার হয়নি মনে হচ্ছে!

—না না!

—তবে, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু-ফিন্তু নেই। আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারো—জেল বা লাইসেন্স খোয়ানো তোমার আশঙ্কার ও-দুটোর কোনটাই শেষ পর্যন্ত হবে না। হবে না কেননা, তোমার স্বীকারোক্তি পুলিশের হাতে পড়বে না। আমার মক্কেল বেন মোজেসকে শুধু সেটা একবার দেখাবো, আমি। আর, দেখালেই কাজ হবে। তাহলেই সোজা পথে হাঁটবে সে!

শুনে স্যাম ডেভিড একবার তাকাল আমার হাতে পিস্তলের দিকে।

—কী ভাবছো?

স্যাম ডেভিড বলল—না, কিছু না। চলো, টেবিলে গিয়ে একেবারে কাগজ নিয়ে বসছি। তোমার প্রশ্নের উত্তরগুলি একেবারে

কাগজে লিখে গেলেই মনে হয় তোমার প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি লেখা হয়ে যাবে।

মিনিট চল্লিশ পরে নিচে নেমে দেখি—অত দেরি দেখে ট্যাক্সি-ড্রাইভার মহাখাপ্পা। পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে অগ্রিম বখশিস ব'লে তাকে তো ঠাণ্ডা করলাম। তারপর বললাম ব্যারাকপুর চলো। একটু তাড়াতাড়ি। আবার বখশিস পাবে।

—জি, হুজুর! ব'লে সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল গাড়িতে। আর আমি উঠে ভাল করে গাড়িতে বসতে না বসতেই ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।

বউবাজার থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুতে পড়েই সর্দার সত্যিকার ভানুমতীর খেল দেখাতে শুরু করল ট্যাক্সি নিয়ে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে যেন ট্যাক্সি। এই চাপা দেয়, ধাক্কা লেগে অ্যাক্সিডেন্ট হয় হয়—তারপরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, পরমুহূর্তেই আবার আঁতকে ওঠার জন্যে! কিন্তু এত করেও কি সময় মতন পৌঁছোতে পারব কি শেষ পর্যন্ত?

শ্যাম ডেভিডের জ্ঞান হতে কতক্ষণ সময় লাগবে, কে জানে? আসবার সময় পিস্তলের বাঁটটা একটু ছুঁইয়ে দিয়ে এসেছি ওর মাথার। টেবিলের ওপর টেলিফোনের তারটাও ছিঁড়ে দিয়ে এসেছি দেওয়াল থেকে!

শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে বি. টি. রোডে এসে পড়তে এবার সর্দার উড়িয়ে নিয়ে চলল ট্যাক্সি। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে আসা হাওয়ার ঝাপটায় মাথায় যন্ত্রণাটা যেন কমে এল অনেক।

দক্ষিণেশ্বর পেরুতে পেরুতে মাথাটা যেন একটু রাখতে পারলাম পেছনের গদীতে। রেখে দু'চোখ বুজে হেলান দিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম মুখে, গলায়, বুকে—ঝোড়ো বাতাসের লুটোপুটি।

পানিহাটি পৌঁছোতে পৌঁছোতে জানলার কাঁচ তুলে দিয়ে ধরিয়ে ফেললাম সিগারেট। বেশ কয়েকটা টান দিতে মাথার ব্যথাটা যেন কমে এল আরও।

তারপর ব্যারাকপুর পৌঁছে মোজেসদের বাড়ির গেটে গিয়ে যখন দাঁড়াল ট্যাক্‌সি, তখন ব্যথাটা যেন আর নেই, শরীরও যেন অনেক ঝরঝরে। মাথায় আরেকবার পিস্তলের বাঁটের ঘা খাবার জন্যেও যেন আমি প্রস্তুত।

গেট খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল দারোয়ান। তাকে ডেকে জিগ্যেস করলাম —আধঘণ্টার মধ্যে বাইরের কেউ এসেছে এখানে ট্যাক্‌সি ক'রে ?

- হ্যাঁ, এসেছে। শুধু তাই নয়, তার ট্যাক্‌সি এখনো রয়েছে ভেতরে জানা গেল দারোয়ানের উত্তরে।

—কে এসেছে ? সাহেবের ভাই ?

—হ্যাঁ !

তারপর গেট ছেড়ে একটু পথ এগোতেই, বাগানের ঘোরানো রাস্তাটা সোজা হতেই আমার নজরে পড়ল বাড়ির গাড়ি-বারান্দার তলায় একটি কালো গাড়ি এবং তার পেছনে অপেক্ষমান আর একটি ট্যাক্‌সি। আমার ট্যাক্‌সিটা গিয়ে সেগুলির পেছনে দাঁড়াতেই তাড়াতাড়ি নেমে এগিয়ে গেলাম সেই ট্যাক্‌সির কাছে। গিয়ে জিগ্যেস করলাম সেই ট্যাক্‌সির ড্রাইভারকে—কোত্থেকে আসছ ? চৌরঙ্গী থেকে কি ?

বাঙালি ড্রাইভারটি বলল—হ্যাঁ।

—নিউ এম্পায়ায় সিনেমার কাছ থেকে কি ?

—হ্যাঁ।

পট পট মিলে যেতে লাগল কথাগুলি। রহস্যের কিনারা আর গোয়েন্দাগিরি কাজের সবচেয়ে মজা এই যে, সমাধানের সূত্রগুলি একবার মিলতে শুরু করলে আর উপায় নেই —পুরো ছকটা হুবহু মিলে তবে ছাড়বে। তখন শুধু ব'সে ব'সে সেই ঘটনাগুলি মেলাবার আর মজা দেখবার সময় !

কিন্তু ব'সে সেই মজা দেখবার সময় তখনও নয় আমার। বেন মোজেসের ট্যাক্‌সি-ড্রাইভারকে ছেড়ে ইতিমধ্যে গাড়ি-বারান্দা দিয়ে উঠে

বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমি। গিয়ে দাঁড়িয়েছি দোতালায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ির মুখে; আর একটি বেয়ারার চোখে পড়ে গেছে ততক্ষণে।

দেখে ব্যস্ত হয়ে বেয়ারাটি এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল কাকে চাই?

—সাহেবের ভাই এসে কতক্ষণ বসে আছে? একরকম প্রায় ধমকেই তাকে জিগ্যেস করলাম আমি।

—কিছুক্ষণ। ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল সে। বোধ হয় হার-চুরির ব্যাপারে আসা পুলিশের লোক মনে করেই। ভয়ে ভয়েই জিগ্যেস করল—তাঁকে ডেকে দেব?

—কোথায় সে?

—ওপরের ঘরে!

—সাহেব-মেমসাহেব কতক্ষণ ফিরেছেন?

—এই মাত্র। তাঁদের খবর দেব?

—মোটেই না! যাও, তোমার কাজে যাও।

ব'লে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা বেয়ারার দিকে আর দৃক্‌পাত না-করে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে শুরু ক'রে দিলাম আমি।

দোতলায় উঠেই প্রথমে চোখে পড়ল বাঁয়ে—নিচের গাড়ি বারান্দার ঠিক ওপরে খোলা একটা অফিস-ঘর। কেউ নেই সেখানে। ডাইনে তাকাতে দেখলাম—পর্দার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখি—প্রশস্ত এবং সাজানো বসবার ঘর একটা! কিন্তু কেউ নেই কোথাও। সামনের দেওয়ালে ঝুলছে একটা ছবি—নিশ্চয় আইজাক মোজেসের। খবরের কাগজের ছবির মতনই বিরাট টাক রয়েছে মাথার সামনের দিকে। তবে খবরের কাগজের ছবিতে সেটা অতটা বোঝা যায়নি, সেটা হল আমার মক্কেল বেন মোজেসের সঙ্গে এই ছবিতে সেই চেহারার সাদৃশ্যটা অনেক বেশি প্রকট।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে একমনে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ ডানদিকের পুরু পর্দা ঝোলানো একটা দরজা দিয়ে যেন অস্পষ্ট কথা ভেসে এল কয়েকটা।

শোনামাত্র সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালাম পর্দাটার কাছে।

তারপর কানটা খাড়া করে রাখতেই হঠাৎ পরিচিত একটা গলা কানে ভেসে এল আমার।

চুপ করে থেকে পার পাবে না আমার কাছে। দশ পর্যন্ত গুণব আমি। তার মধ্যে ঠিকঠাক জবাব দিলে তো ভাল, না হলে জেনে রাখো, তোমাদের দু জনকে খতম করতে, ঘেয়ো কুকুরের মতন গুলি ক'রে মারতে এতটুকু দ্বিধা করব না আমি! এতটুকুও হাত কাঁপবে না আমার!

গলাটা, আর কারুর নয়, আমার মাথায় দু-দুবার পিস্তলের বাঁট মারা সেই হতভাগার!

ধীরে ধীরে পর্দাটা একটু ফাঁক করলাম আমি। ফাঁকে চোখ রেখে দেখলাম, নাটকীয় এক দৃশ্য!

দেওয়ালের ছবির ওই টাক-মাথা লোকটা, আইজাক মোজেসই নিশ্চয়, বোকার মতন মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। আর তাকে প্রায় জড়িয়ে আগলে রয়েছেন ভীতনয়না একটি মহিলা।

মহিলাটি আমার আগের দেখা এবং একরকম চেনাও এখন। কাল রাতে আমাকে বিপদে ফেলতে ক্লাব থেকে বিনা নোটিশে ইনিই ফিরে এসে ঢুকেছিলেন সিন্দুকের ঘরে। তারপর সিন্দুক ফাঁক দেখে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, স্বামীকে ক্লাবে ফোন করতে। অর্থাৎ, গৃহকর্ত্রী মিসেস আইজাক মোজেস!

আর, স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই তাঁরা ভীত ও সম্মোহিত নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন,—আমার মাথায় দু-দুবার পিস্তলের বাঁট-মারা সেই হতভাগাটার হাতের পিস্তলের দিকে। এক···দুই করে চার পর্যন্ত গুণেও ফেলেছে ইতিমধ্যে হতভাগা!

আমার দিকে পেছন ক'রে রয়েছে সে এবং পর্দাটা থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পিস্তলটা বের ক'রে হাতে নিলাম আমি।

—পাঁচ !···ছয় !···সাত !···গুণে ফেলেছে এর মধ্যে সেই শয়তানটা। ঘুরিয়ে পিস্তলের নলটা হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে চেপে ধরলাম আমি। ধরে প্রস্তুত রইলাম।

—আট !···নয় ! ··ক্লিক···

শেষের ক্লিকটা পিস্তলের সেফ্‌টি ক্যাচ খোলবার আওয়াজ শয়তানটার।

—ডুম !

হ্যাঁ, ডুম তবে গুলির আওয়াজ নয়। কাটা কলাগাছের মতন ঘরের কার্পেটে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে গেল, স্বয়ং সেই যার গুলি ছোঁড়বার কথা।

হ্যাঁ, শয়তানটাই। অর্থাৎ, চকিতে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে আমার মাথায় দু-দুবার আঘাতের দেনাটা তাকে সুদে-আসলে শোধ করতে গিয়ে সঙ্গের সুদটা তাড়াতাড়িতে একটু অতিরিক্ত চড়া হারেই দিয়ে ফেলেছি আমি।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ফারিত হয়ে গেছে ততক্ষণে টাকমাথা ও মহিলার মুখ। আইজাক মোজেসের মুখটা কেমন একটু ঝুলেও পড়েছে সেই সঙ্গে।

জুতোর এক ঠোক্করে বেহুঁশ শয়তানটার হাতের কাছ থেকে পিস্তলটা সরিয়ে দিলাম ঘরের এক কোণে। কত তাড়াতাড়ি জ্ঞান হবে হতভাগার, কে জানে ?

মানে ঠিক কতখানি শক্ত ওর মাথার খুলি, ঠিক কতটা চোট ওর মগজে পৌঁচেছে, সেটা যখন জানা নেই !

—আপনি ? বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে প্রথমে প্রশ্ন করে উঠলেন মহিলাটি।

—আমার নাম কুশল চৌধুরী। হ্যারি চৌধুরী বললে চিনতে পারবেন। কয়েক ঘণ্টা আগে ঐ নামেই তো আপনি আমার খোঁজ করেছিলেন, নিউ এম্পায়ার-এ !

—আ -আ—আ—আমি ? উত্তরে তোংলাতে লাগলেন মহিলা।

তারপর আর কথা খুঁজে না-পেয়ে ভীতনয়নে ফিরে তাকালেন তাঁর স্বামীর দিকে।

—হ্যাঁ, আপনিই! ধমকে উঠলাম আমি—আর আমার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে! তবে আসল আলাপ ও পরিচয় আমার—আপনার স্বামীর সঙ্গে! কালো চশমা প'রে এবং সেইসঙ্গে পরচুলো পরা টাক মাথাটি টুপিতে ঢেকে বেন মোজেস পরিচয়ে উনি গত বেস্পতিবার গিয়েছিলেন আমার অফিসে। আমাকে দিয়ে ঐ সিন্দুকের ঘরে চোর আসার একটা অভিনয় করাতে। অবশ্য ব্যাপারটা আপনার অজানা নয়। সেই চুরি আবিষ্কার করতেই তো ক্লাব থেকে মাথা ধরার নাম ক'রে বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন আপনি! কিন্তু আবিষ্কারের অভিনয়টা মোটেই ভাল করেননি। অবিশ্যি কেনই বা করবেন খামোকা? আপনি কী করে জানবেন যে, আলমারির আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনাকে আমি লক্ষ্য করছি?

শুনতে শুনতে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মহিলার মুখ। আইজাক মোজেসেরও। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রতিবাদও করে উঠল সে—মিথ্যে কথা! আমার বাড়ির সিন্দুকের জিনিস চুরি করাতে আমি কেন যাবো আপনার কাছে?

আমি হেসে বললাম—কেন যাবেন নয়, কেন গিয়েছিলেন শুনবেন? গিয়েছিলেন যাতে আপনার বহুদিন আগের বেচে দেওয়া রত্নহারটা এই এবার চুরি গিয়েছে ব'লে বোঝাতে পারেন সকলকে। বিশেষ ক'রে বেচারী এই বেঞ্জামিনকে এ-পর্যন্ত আপনার সব রকম শয়তানি সহ্য ক'রে এবার যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছে—ঐ রত্ন-হারের জন্য।

—হারটা যে আমিই বেচেছি, তার প্রমাণ? কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে?

—নিশ্চয়ই আছে। উকিল স্যাম ডেভিডকে নিশ্চয়ই চেনেন! প্রমাণটা আসলে সেই উকিল স্যাম ডেভিডের একটি স্বীকারোক্তি!

—মিথ্যে কথা। এমন কোন স্বীকারোক্তি কখনো করতেই পারে না স্যাম।

—পারে কি, পারে না, ভাল করে বুঝতে পারবেন ঐ স্বীকারোক্তিতে স্যাম ডেভিড কী কী বলেছে সেটা শুনলে। আমি অমায়িকভাবে হাসলাম স্যাম ডেভিড বলছে যে—আপনার মা বেঁচে থাকতেই আপনার স্ত্রী ওই হারটা একদিন পরবার জন্যে চেয়ে নিয়ে আপনাকে দেয়। তারপর আপনি সেটার একটা নকল তৈরি করান এবং মায়ের চোখের অসুখের সুযোগ নিয়ে সেই নকলটাই আসল হার হার বলে স্ত্রীকে দিয়ে ফেরত দেওয়ান। তারপর, বলাবাহুল্য আসলটা বেচে দেন! তারপর এবার বেঞ্জামিন এসে স্যামকে তার মস্ত হিতাকাঙ্খী বন্ধু মনে ক'রে তার মনের কথা ও মতলব যা যা বলেছে, সে-সবই স্যাম জানিয়েছে আপনাকে! আর তখনই বেঞ্জামিন সম্বন্ধে সব জেনে বেঞ্জামিন সেজে এসে আমার কাছে বেঞ্জামিনের মনোভাব পুরো প্রকাশ ক'রে চুরির ওই প্রস্তাবটা আপনি করেন। যদি কোন ভাবে মতলব ফেঁসে যায় বা ধরা পড়ে যাই আমি, তাহলে বেঞ্জামিনের নাম ও হদিশই তখন আমি বলব পুলিশকে। পুলিশও ধরবে বেঞ্জামিনকে, সন্দেহ করবে তাকে লুকিয়ে কলকাতায় থাকবার জন্যে!

শুনতে শুনতে আইজাক মোজেসের টকটকে লাল মুখ ছাইয়ের মতন সাদা হয়ে গেল।

আমি হেসে বললাম বুঝতেই পারছেন, সত্যিকার স্বীকারোক্তি স্যাম ডেভিড যদি না করতো এত কথা আমি জানতে পারতাম না। বলুন, পারতাম কি?

শুনে দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল আইজাক মোজেস। তার স্ত্রী ফ্যালফ্যাল ক'রে একবার দেখতে লাগল আমাকে, আর একবার ফিরে তার স্বামীকে!

গেটের কাছ থেকে হর্ন ভেসে এল জীপের-পুলিশ জীপের। বাগচির আসার সময় হয়েছে এতক্ষণে!

ধরাশায়ী বেন মোজেসও কার্পেটের ওপর নড়তে শুরু করেছে যেন একটু !

আর সময় নেই। ফলে, তৎপর হতে হল আমাকে। আইজাক মোজেসের কাছে গিয়ে কাঁধ ধ'রে নাড়া দিলাম তার। বললাম, গোয়েন্দা-পুলিশের কর্তা, বাগচি আসছেন। এ হর্ন তাঁর জীপের। এদিকেও তাকিয়ে দেখুন বেঞ্জামিনেরও হুঁশ ফিরে আসছে। ছেলেমানুষের মতন মুখ না ঢেকে কী করবেন, স্থির করুন।

—আপনি যা বললেন, তাতে কী করবার আছে আমার? মুখ থেকে হাত নামিয়ে বলল আইজাক মোজেস—সবই তো এখন জেনে ফেলেছে পুলিশ !

—এখনো জানেনি। স্যাম ডেভিডের স্বীকারোক্তির কথা এখনো জানে না পুলিশ বা বেঞ্জামিন। করেছেন, করেছেন। এখন প্রয়োজন হলে সর্বস্ব বেচেও বেঞ্জামিনকে তার রত্ন-হারের ক্ষতিপূরণ করতে যদি প্রস্তুত থাকেন তো সে স্বীকারোক্তির কথা জানতে পারবে না কেউ। কী - আপনি রাজী?

—রাজী। আমি রাজী।

—বেশ, তাহলে আপনারা স্বামী-স্ত্রী বাইরে বসবার ঘরে গিয়ে পুলিশকে সামলান। ওদেরকে বলবেন যে, আপনি আজ সকালে জানতে পেরেছেন যে, রত্ন-হারটার আসল মালিক যে, অর্থাৎ আপনার ভাই বেন, সে-ই ক'দিন আগে শেষ যখন এসেছিল এই বাড়িতে—তখনই হারটা নিয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে সিন্দুকটা বন্ধ করে যাওয়া এবং খবরটা আপনাদের দিয়ে যাওয়ার শুধু কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। জানলার ওই শিকটা আগেই বেঁকানো ছিল বলে আপনার এবার মনে পড়েছে। ও-রকম দামী রত্নহার চুরি গিয়েছে দেখে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আপনার আর তাই মনে ক'রে আগে বলতে পারেন নি।

—আর আপনার গাড়ি-চুরি?

—হার-চুরির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, হারটা চুরিই

যায়নি। যান, আর দেরি করবেন না। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে!

—আপনি?

—আমি এ-ঘরে বেঞ্জামিনের কাছে থাকছি। হুঁশ এখনি ফিরে আসবে তার। এলে, তাকেও তো সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে হবে!

কীসের টাকা? জিগ্যেস করল এলা সোমবার অফিসে গিয়ে। একশ টাকার কড়কড়ে তিনটে নোট ওর হাতে গুণে দিতে।

—তোমার বোনাস। আমি হেসে বললাম—বেন মোজেসের মামলার! তুমি না হলে রহস্যের কিনারা বোধহয় এতো তাড়াতাড়ি ক'রে উঠতে পারতাম না।

শুনে খুশী হতে গিয়েও যেন হতে পারল না এলা। কেমন যেন খটকা লাগা সুরে বলল—কেন, আমি কী এমন করলাম?

আমি বললাম—তবে শোনো। সেদিন আমার চেম্বারে মক্কেল বেন মোজেসের টুপি প'রে ব'সে থাকাটা তুমিই লক্ষ্য করেছিলে। বলেও ছিলে আমাকে আর তখন খেয়াল না করলেও কথাটা আমার মাথায় থেকে গিয়েছিল। তার ন্যাটা ও অনেকটা এক ধরনের চেহারা ব'লে হার-চোর লোকটাই মক্কেল বেন মোজেস কি না—একটা সন্দেহ ঢুকেছিল মাথায়, কিন্তু কাল নিউ এম্পায়ার-এ একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পরমুহূর্তেই আরেক জনকে এসে বক্সে দেখতে পেয়ে সে-সন্দেহটা কেটে গেল। কিন্তু সে-সন্দেহ কেটে গিয়ে নতুন এক সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। দু-জন লোকই ন্যাটা দেখে যেন কেমন খটকা লাগল মনে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার চেম্বারে ব'সে বেন মোজেসের পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বল তৈরি করার ঘটনাটা। আর তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

—কী ক'রে?

—জেনে শুনে কেউ নোট নিয়ে ও-রকম বল তৈরি করে না। করলে: —ভুলে, মনের অজান্তে করে। আর, মনের অজান্তে করা কাজ দিয়ে কাউকে ধাপ্পা দেওয়া চলে না।

—তা নয় চলে না, কিন্তু তা দিয়ে রহস্যের সমাধান হ'ল কী ক'রে ?

—তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, নোটে ওই বলটা ডান হাতে করেছিল মক্কেল বেন মোজেস ?

—দাঁড়ান, মনে করি, বলে এলা এক মুহূর্তে চোখ বুজল, তারপর চোখ খুলে বলল - হ্যাঁ, তাই।

—তার মানে, আসলে মক্কেল বেন মোজেস ন্যাটা নয় সাজবার চেষ্টা করেছে। আর ন্যাটা সাজবার চেষ্টা মানে—যে-মানুষ সে নয়—সেটাই সাজবার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ আসল বেন মোজেসও তাহলে সেটা নয় সেটাও সাজবার চেষ্টা করছে। আসল বেন মোজেস কি তাহলে হার-চোর সেই ন্যাটা লোকটা ? তাই যদি হয় তো মক্কেল বেন মোজেস কেন ? নিশ্চয় এমন কেউ—যে আসল বেন মোজেসের মতলব ও গতিবিধির খবর রাখে। ভাবতে গিয়ে মক্কেল বেন মোজেসের মাথার টুপির কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমার চেম্বারে ঢুকে টুপিটা না খোলার কারণ কী থাকতে পারে তার ? মাথার টাক ? চেম্বারে ঢুকে এবং চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দু'-দু'বার মাথা থেকে টুপিটা একবার করে শুধু তুলে ধরেছে মক্কেল বেন মোজেস। তবে কি ওর মাথায় যে-চুলটা দেখেছি সেটা পরচুল ? দেখাতেও চেয়েছে, আবার ভরসা করে খুলেও রাখতে পারেনি অতক্ষণ আমার চোখের সামনে! তার মানে—আসলে তার মাথায় টাক কিন্তু সর্বক্ষণ মাথায় টুপি দেখে যদি সেই সন্দেহ কেউ করে তাই পরচুল মাথায় দিয়ে ঐভাবে দু'-এক সেকেণ্ডের জন্য টুপিটা দু'-দু'বার তুলে ধরেছে মাথা থেকে।

—আশ্চর্য! মক্কেল বেন মোজেসের কথাগুলি সবই তো মিলিয়ে নিয়েছিলাম আমরা বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে। ভাবতে ভাবতে বলল এলা - শুধু একটি ছাড়া!

—তার মানে, সেই একটি ছাড়া, মক্কেল বেন মোজেসের প্রত্যেকটি কথাই সত্যি—আসল বেন মোজেস সম্বন্ধে। আমি বললাম।

এলা গম্ভীর হয়ে বলল—ওটা না-মেলানোটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে আমাদের।

—হ্যাঁ, ভুল হয়েছে তবে মিলিয়েও লাভ হ'ত না কোন!

—কেন? এলা বুঝতে না-পেরে জিগ্যেস করল।

-কারণ— আমি হেসে বললাম— মেলাতে গেলে সেটাও মিলতো। অর্থাৎ, স্যাম ডেভিডও বলতো - হ্যাঁ, বেন মোজেসকে সে পাঠিয়েছে আমার কাছে। কিন্তু সেটা সত্যি হ'ত মক্কেল বেন মোজেস সম্বন্ধে - আসল বেন মোজেস সম্বন্ধে নয়। যখন বুঝতে পারলাম মক্কেল বেন মোজেস সম্বন্ধে সত্যিকার অবহিত একমাত্র স্যাম ডেভিড, তখন কাজটা আমার সোজা হয়ে গেল। নিউ এম্পায়ার থেকে বেরিয়ে তার কাছেই তাই প্রথমে গিয়েছিলাম আমি। কী, সমাধান কীভাবে হ'ল—পরিষ্কার হ'ল সেটা?

এলা ঘাড় কাত ক'রে বলল - হ্যাঁ।

কিন্তু তখনও ব্যাগে না পুরে নোট তিনটে হাতে নিয়ে এলা নাড়া-চাড়া করতে লাগল দেখে বললাম--কী হল এলা? টাকাটা পেয়ে মনে হচ্ছে, তুমি খুশী হওনি?

—না, হয়েছি। বোনাস পেলে কে না খুশী হয়। এলা গম্ভীর হয়ে জবাব দিল।

- তুমি কি আরো বেশি আশা করেছিলে?

- না। তবে আমাকে বোনাস না দিয়ে আইজাক মোজেসকে ধ'রে জেলে দিলে আমি এর চেয়ে অনেক বেশি খুশী হতাম।

শুনে তো আমি যাকে বলে যৎপরোনাস্তি অবাক হয়ে গেলাম। আকাশ থেকে আছড়ে পড়ার মতন ব্যথিত সুরে বললাম কী বলছো, এলা? তোমার কি মাথাখারাপ হয়ে গেল? বেনামে হলেও হাজার হোক মক্কেল তো সে আমার? আর, মক্কেল মানেই লক্ষ্মীকে জেলে দেবার কথা চিন্তা করাও পাপ, বিশেষ করে, যে-লক্ষ্মী হাজার টাকা

দেবার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত দু'হাজার টাকা দেয়। কড়ারং করা মজুরি হাজার টাকার সঙ্গে আরো হাজার টাকা বোনাস। তাছাড়া, এলা -

এলার পিঠে হাত দিয়ে আমি বললাম—তাছাড়া, তুমি আর আমি কী চোর-ধরা পুলিশ? আমরা মানুষের মুস্কিল-আসান।

শেষ